يَسْتَفْتُوْنَكَ ؕ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ
لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَاۤ
اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا
تَرَكَ ؕ وَاِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَآءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْاُنْثَيَيْنِ ؕ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿١٧٦﴾

سُوْرَةُ الْمَآئِدَةِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مِائَةٌ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّسِتَّةَ عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ
الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَلَا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَآئِدَ وَلَاۤ اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ؕ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ
تَعْتَدُوْا ۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*(১৭৬) মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায়—অতএব, আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদিগকে 'কালালাহ' –এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ বাতলে দিচ্ছেন; যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এক বোন থাকে, তবে সে পাবে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। তা দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই ও বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দুজন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ্ তোমদিগকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।*

**সূরাতুল - মায়েদাহ**
**মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত, ১২০**

*পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে*

*(১) মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর। তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে; যা তোমাদের কাছে বিবৃত হবে তা ব্যতীত। কিন্তু এহ্রাম বাঁধা অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না! নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন, নির্দেশ দেন। (২) হে মুমিনগণ! হালাল মনে করো না আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ এবং সম্মানিত মাসসমূহকে এবং হরমে কুরবানীর জন্যে নির্দিষ্ট জন্তুকে এবং ঐসব জন্তুকে, যাদের গলায় কন্ঠাভরণ রয়েছে এবং ঐসব লোককে, যারা সম্মানিত গৃহ অভিমুখে যাচ্ছে, যারা স্বীয় পালনকর্তার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। যখন তোমরা এহ্রাম থেকে বের হয়ে আস, তখন শিকার কর। যারা পবিত্র মসজিদ থেকে তোমাদেরকে বাধা প্রদান করেছিল, সেই সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে। সৎকর্ম ও খোদভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা।*

আলোচ্য আয়াতে نور (নূর) শব্দ দ্বারা কোরআন মজীদকে বোঝানো হয়েছে।—(রূহুল–মা'আনী) যেমন, সূরায়ে মায়েদার আয়াত قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ অর্থাৎ, তোমাদের কাছে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এক উজ্জ্বল আলো তথা এক প্রকৃষ্ট কিতাব অর্থাৎ, কোরআন এসেছে।—(বয়ানুল কোরআন)

আবার নূর অর্থ রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং কিতাব অর্থ আল–কোরআনও হতে পারে।—(রূহুল মা'আনী) তবে তার অর্থ এই নয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানবীয় দৈহিকতা থেকে পবিত্র শুধু নূর ছিলেন।

সূরা আন–নিসা সমাপ্ত

## সূরাতুল মায়েদাহ

### তফসীরের সার–সংক্ষেপ

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ এখানে আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ এবং 'কালালাহ্র' হুকুম বর্ণনার মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় জানা গেল।

প্রথমত ঃ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ বলার পর দৃষ্টান্ত স্বরূপ আহলে–কিতাবদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। তদ্রূপ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَاعْتَصَمُوْا আয়াতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবায়ে–কেরামের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে যাতে করে ওহী হতে যারা পরাঙ্মুখ তাদের পথভ্রষ্টতা ও সর্বনাশ এবং ওহীর আনুগত্য ও অনুসরণকারীদের সাফল্য ও সৌভাগ্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ জানা গেল যে, আহলে–কিতাবরা আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তার জন্য অংশীদার ও পুত্র সাব্যস্ত করার মত হীন মানসিকতাকে নিজেদের ঈমানের অঙ্গ বানিয়েছে। হঠকারিতার সাথে আল্লাহ্র ওহীর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অপর দিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর সাহাবায়ে–কেরাম ধর্মীয় মূলনীতি ও এবাদত তো দূরের কথা লেন–দেন, আচার–ব্যবহার, বিবাহ–শাদী এমনকি মীরাস বন্টনের মত ব্যাপারেও নিজেদের বুদ্ধি–বৃত্তিকে যথেষ্ট মনে করতেন না, বরং সর্ব ব্যাপারেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর দিকে তাকিয়ে থাকতেন, ওহীর প্রতীক্ষা করতেন। যদি একবারে সান্ত্বনা না পেতেন, তবে আবার রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর সমীপে হাযির হয়ে জানতে চাইতেন।

তৃতীয়ত ঃ আরো বোঝা গেল যে, হযরত সাইয়্যেদুল–মুরসালীন (সাঃ) ওহীর হুকুম ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কোন আদেশ জারি করতেন না। যদি কোন ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোন ওহী না থাকতো, তবে তিনি ওহীর প্রতীক্ষা করতেন। এখানে আরো ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আহ্লে–কিতাবদের আবদার অনুসারে ওহী এক সাথে নাযিল না হয়ে যথাসময়ে অল্প–অল্প নাযিল হওয়া অতি উত্তম ছিল। কারণ, এমতাবস্থায় যে কোন ব্যক্তি নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে প্রশ্ন করার সুযোগ পায় এবং ওহীর মাধ্যমে জবাব জানতে পারে। যেমন, অত্র আয়াতে এবং কোরআন মজীদের আরো বহু আয়াতে তার নজীর দেখতে পাওয়া যায়।

এ ব্যবস্থাটি অধিক উপকারী ও কার্যকরী। তাছাড়া স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক বান্দাকে স্মরণ ও সম্বোধন করা বন্দার জন্য অতি সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় যা পূর্ববর্তী উম্মতগণ হাসিল করতে পারেনি।

وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

যে কোন সাহাবীর কল্যাণার্থ বা যার প্রশ্নের উত্তরে কোন আয়াত নাযিল হয়েছে, উক্ত আয়াত তাঁকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করেছে। আর মতভেদ হলে যার বক্তব্য অনুসারে ওহী নাযিল হয়েছে, কেয়ামত পর্যন্ত চিরদিন তাঁর সুনাম ও সুখ্যাতি বজায় থাকবে। যাহোক, 'কালালাহ' সম্পর্কে প্রশ্ন ও উত্তর উল্লেখ করে উপরোক্ত সমাধানসমূহের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে।— (ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

**শানে নুযূল ঃ** এটি সূরা মায়েদার প্রথম আয়াত। সূরা মায়েদা সর্বসম্মতিক্রমে মদীনায় অবতীর্ণ। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যেও এটি শেষ দিককার সূরা। এমনকি, কেউ কেউ একে কোরআন মজীদের সর্বশেষ সূরাও বলেছেন। মুসনাদে-আহ্‌মদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আসমা বিনতে এয়াযীদের (রাঃ) বাচনিক বর্ণিত আছে, সূরা মায়েদা যে সময় অবতীর্ণ হয়, সে সময় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সফরে 'আযবা' নামীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। সাধারণতঃ ওহী অবতরণের সময় যেরূপ অসাধারণ ওজন ও বোঝা অনুভূত হতো, তখনও যথারীতি তা অনুভূত হয়েছিল। এমনকি ওজনের চাপে উষ্ট্রী অক্ষম হয়ে পড়লে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নীচে নেমে আসেন। কোন কোন রেওয়ায়েত দৃষ্টে বোঝা যায় যে, এটি ছিল বিদায় হজ্বের সফর। বিদায় হজ্ব নবম হিজরীর ঘটনা। এ হজ্ব থেকে ফিরে আসার পর হুযুর (সাঃ) প্রায় আশি দিন জীবিত ছিলেন। ইবনে হাব্বান 'বাহরে-মুহীত' গ্রন্থে বলেন ঃ সূরা মায়েদার কিয়দংশ হোদায়বিয়ার সফরে, কিয়দংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিয়দংশ বিদায় হজ্বের সফরে অবতীর্ণ হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ সূরাটি সর্বশেষ সূরা না হলেও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

রুহুল-মা'আনী গ্রন্থে আবু ওবায়দাহ্ হযরত হামযা ইবনে হাবীব এবং আতিয়্যা ইবনে কায়স বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

المائدة من آخر القرآن تنزيلا فاحلوا حلالها وحرموا حرامها

অর্থাৎ, 'সূরা মায়েদাহ্ কোরআন অবতরণের শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এতে যা হালাল করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্যে হালাল এবং যা হারাম করা হয়েছে, সেগুলোকে চিরকালের জন্যে হারাম মনে করো।'

ইবনে-কাসীরে এমনি ধরনের একটি রেওয়ায়েত হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, তিনি একবার হজ্বের পর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেন ঃ জুবায়ের, তুমি কি সূরা মায়েদাহ্ পাঠ কর ? তিনি আরয করলেন, জী-হাঁ, পাঠ করি। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ এটি কোরআন পাকের সর্বশেষ সূরা। এতে হালাল ও হারামের যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত আছে, তা অটল। এগুলো রহিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কাজেই এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান থেকো।

সূরা মায়েদায়ও সূরা নেসার মত বিভিন্ন বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল, লেন-দেন, পারস্পরিক চুক্তি-অঙ্গীকার ইত্যাদির বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। এ কারণেই রুহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন ঃ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সূরা বাক্বারা ও সূরা আলে-ইমরান অভিন্ন। কেননা, এ দু'টি সূরায় প্রধানতঃ মৌলিক বিধি-বিধান ও আকায়েদ, যথা, তওহীদ, রেসালত, কিয়ামত ইত্যাদির বর্ণনা উল্লেখিত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে সূরা নিসা ও সূরা মায়েদাহ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে অভিন্ন। কেননা, এ দু'টি সূরায় প্রধানতঃ বিভিন্ন বিধি-বিধানের বিস্তারিত আলোচনা স্থান লাভ করেছে এবং মৌলিক বিধি-বিধান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে। সূরা নিসায় পারস্পরিক লেন-দেন ও বন্দার হকের উপর জোর দেয়া হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর হক, এতীমের হক, পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতেও এসব লেন-দেন ও চুক্তি -অঙ্গীকার মেনে চলা ও পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমনঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ হে মুমিনগণ, তোমরা ওয়াদা —অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এ কারণেই সূরা মায়েদার অপর নাম সূরা ওকূদ। অর্থাৎ, ওয়াদা-অঙ্গীকারের সূরা।- (বাহরে-মুহীত)

চুক্তি-অঙ্গীকার ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি বিশেষ করে এর প্রথম আয়াতটি সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমর ইবনে হাযম (রাঃ)-কে ঐ আমলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করেন, তখন এ ফরমানের শিরোনামে উল্লেখিত আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন।

এ সূরার প্রথম আয়াতের প্রথম বাক্যটি এত ব্যাপক অর্থবোধক যে, এর ব্যাখ্যায় হাজারো পৃষ্ঠা লেখা যায় এবং লেখা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে ঃ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ ! স্বীয় চুক্তি-অঙ্গীকার পূর্ণ কর। এতে প্রথমে يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا বলে সম্বোধন করে বিষয়বস্তুর গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, এতে যে নির্দেশ রয়েছে, তা সাক্ষাৎ ঈমানের দাবী। এরপর বলা হয়েছে ঃ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ عقود – عقد – শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাঁধা, আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও عقد বলা হয়। এভাবে عقود এর অর্থ হয় عهود অর্থাৎ, চুক্তি ও অঙ্গীকার।

খ্যাতনামা তফসীরবিদ ইবনে-জরীর উপরোক্ত অর্থে তফসীরবিদ সাহাবী ও তাবেয়ীগণের 'ইজমা' (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাস্‌সাস বলেনঃ দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোন কাজ করা অথবা না করার বাধ্য-বাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই عهد , عقد ও معاهد বলা হয়। আমাদের পরিভাষায় একেই চুক্তি বলা হয়। অতএব, উপরোক্ত বাক্যের সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরী ও অপরিহার্য মনে কর।

এখন দেখতে হবে আয়াতে চুক্তি বলে কোন্ ধরনের চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে? এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের বাহ্যতঃ বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও এবাদত সম্পর্কিত যে সব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাযিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। এ উক্তি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে।

তফসীরবিদ ইবনে সাআদ ও যায়দ ইবনে আসলাম বলেন ঃ এখানে ঐসব চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পরে একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে। যেমন, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি।

কেউ কেউ বলেন ঃ এখানে ঐসব শপথ ও অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা জাহেলিয়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করতো। মুজাহিদ,রবী,কাতাদাহ্

প্রমুখ তফসীরবিদগণও একথাই বলেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সব উক্তির মধ্যে কোন পরস্পরবিরোধিতা নাই। অতএব, উপরোক্ত সব চুক্তি ও অঙ্গীকারই عقود শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কোরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এ কারণেই ইমাম রাগেব বলেন ঃ চুক্তির যত প্রকার রয়েছে, সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বলেন ঃ এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি। (এক)–পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। উদাহরণতঃ ঈমান ও এবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার। (দুই)– নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন, নিজ যিম্মায় কোন বস্তুর মান্নত মানা অথবা শপথ করে কোন কাজ নিজের উপর জরুরী করে নেওয়া । (তিন) – মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি। এছাড়া সে সব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়।

বিভিন্ন সরকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেন–দেন, বিবাহ, ব্যবসা, শেয়ার, ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে সব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তা মেনে চলা প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য। 'বৈধ' শব্দটি প্রয়োগ করার কারণ এই যে, শরীয়ত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারও জন্যে বৈধ নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ যেসব জীব–জন্তুকে সাধারণভাবে নির্বোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে بهيمة (অস্পষ্ট প্রাণী) বলা হয়। কেননা, মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য مبهم তথা অস্পষ্ট থেকে যায়। ইমাম শা'রানী বলেন ঃ সাধারণ লোকের ধারণা অনুযায়ী এসব জন্তুকে بهيمة বলার কারণ এটা নয় যে, তাদের বুদ্ধি নাই এবং বুদ্ধির বিষয়বস্তু তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়; বরং প্রকৃত সত্য হল এই যে, কোন প্রাণীই বুদ্ধি ও অনুভূতিহীন নয়, এমনকি কোন বৃক্ষ এবং প্রস্তরও নয়। তবে এদের ততটুকু বুদ্ধি নাই, যতটুকু মানুষের রয়েছে।

انعام — শব্দটি نعم এর বহুবচন। এর অর্থ পালিত পশু। যেমন, উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। সূরা আনআমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে انعام বলা হয়। بهيمة শব্দের ব্যাপকতাকে انعام শব্দ এসে সংকুচিত করে দিয়েছে! এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, গৃহপালিত পশু আট প্রকার তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, عقود শব্দ বলে যাবতীয় চুক্তি–অঙ্গীকার বুঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ্ তাআলা হালাল ও হারাম মেনে চলার ব্যাপারে বান্দার কাছ থেকে নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্যে এই বিশেষ অঙ্গীকারটিই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের জন্যে উট, ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন। শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তোমরা এগুলোকে যবেহ্ করে খেতে পার।

আয়াতের প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ — অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করোনা। এখানে شعائر শব্দটি شعيرة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের পরিভাষায় মুসলমান হওয়ার চিহ্নরূপে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে شعائر اسلام তথা 'ইসলামের নিদর্শনাবলী' বলা হয়। যেমন, নামায, আযান, হজ্ব, সুন্নতী দাঁড়ি ইত্যাদি। আয়াতে উল্লেখিত 'আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী'র ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণিত আছে। কিন্তু হযরত হাসান বছরী ও আতা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বাহ্রে–মুহীত ও রূহুল–মাআনী গ্রন্থে উল্লেখিত ব্যাখ্যাটিই পরিস্কার ও সহজবোধ্য। ইমাম জাসসাস এ ব্যাখ্যাটিকে এ সম্পর্কিত সব উক্তির নির্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যাখ্যাটি এই ঃ আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অর্থ সব শরীয়ত এবং ধর্মের নির্ধারিত ওয়াজেব, ফরয ও এদের সীমা।

আলোচ্য আয়াতে لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ বলার সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর এক অবমাননা এই যে, মূলতঃই এসব বিধি–বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। প্রথমতঃ এসব বিধি–বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়তঃ এসব বিধি–বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়তঃ নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন পাক এ নির্দেশটিই শব্দান্তরে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ অর্থাৎ , যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরের খোদা–ভীতিরই লক্ষণ। আয়াতের দ্বিতীয় বাক্যে কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

বলা হয়েছে ঃ

وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا

অর্থাৎ, পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ–বিগ্রহ করে এগুলোর অবমাননা করো না। পবিত্র মাস হচ্ছে শাওয়াল, জিলহজ্ব ও রজব। এসব মাসে যুদ্ধ–বিগ্রহ করা শরীয়তের আইনে অবৈধ ছিল। সাধারণ আলেমগণের মতে পরবর্তী কালে এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এছাড়া হরমে কুরবানী করার জন্তু বিশেষতঃ যেসব জন্তুকে গলায় কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ কন্ঠাভরণ পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করো না। এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা হচ্ছে এদের হরম পর্যন্ত পৌছতে না দেয়া অথবা ছিনিয়ে নেয়া। দ্বিতীয় এই যে, এগুলো কুরবানীর পরিবর্তে অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করা। যেমন, আরোহন করা অথবা দুগ্ধ লাভ করা ইত্যাদি। আয়াত এসব পন্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে।

এছাড়া ঐসব লোকেরও অবমাননা করোনা, যারা হজ্বের জন্যে পবিত্র মসজিদের উদ্দেশে গৃহত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় পালনকর্তার কৃপা ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। অর্থাৎ, পথিমধ্যে তাদের গতিরোধ করো না এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দিয়ো না।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا অর্থাৎ, প্রথম আয়াতে এহ্রাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, এখানে সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা এহ্রাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন শিকারও করতে পারবে।

উল্লেখিত আয়াতে প্রত্যেক মানব ও পালনকর্তার মধ্যকার চুক্তির কয়েকটি অংশ এ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে এতে প্রথমে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর

প্রতি সর্বাবস্থায় সম্মান প্রদর্শন করতে এবং এগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর বিশেষভাবে হজ্ব সম্পর্কিত আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর কিছু বিবরণ রয়েছে। তন্মধ্যে হজ্বের উদ্দেশে আগমনকারী যাত্রীসাধারণ ও তাদের সাথে আনীত কুরবানীর জন্তুদের প্রতিরোধ ও সেগুলোর অবমাননা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

অতঃপর চুক্তির দ্বিতীয় অংশ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا

অর্থাৎ, যে সম্প্রদায় হোদায়বিয়ার ঘটনার সময় তোমাদের মক্কায় প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে বাধা প্রদান করেছিল এবং তোমরা তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলে, এখন শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে তোমরা তাদের কাছ থেকে এভাবে প্রতিশোধ নিও না যে, তোমরা তাদের কাবাগৃহে ও পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং হজ্ব করতে বাধা দিতে শুরু করবে। এটাই হবে জুলুম। আর ইসলাম জুলুমের উত্তরে জুলুম করতে চায় না। বরং ইসলাম জুলুমের প্রতিদানে ইনসাফ এবং ইনসাফে কায়েম থাকার শিক্ষা দেয়। তারা শক্তি ও ক্ষমতা হাতে পেয়ে মুসলমানদের পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে অন্যায়ভাবে বাধা দিয়েছিল। এখন এর প্রত্যুত্তরে এরূপ হওয়া সমীচীন নয় যে, মুসলমানরা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তাদের হজ্বের ক্রিয়াকর্ম থেকে বাধা প্রদান করবে।

কোরআন পাকের শিক্ষা এই যে, ইনসাফ ও ন্যায়বিচারে শত্রু-মিত্র সব সমান। তোমাদের শত্রু যতই কঠোর হোক সে তোমাদের যতই কষ্ট দিয়ে থাকুক, তার ব্যাপারেও ন্যায়বিচার করা তোমাদের কর্তব্য।

এটা ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য যে, সে শত্রুদের অধিকারও সংরক্ষণ করে এবং তাদের অন্যায়ের প্রত্যুত্তরে অন্যায় দ্বারা নয়; বরং ন্যায় বিচার দ্বারা দিতে শিক্ষা দেয়।

**পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কোরআনী মূলনীতি ঃ**

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার দ্বিতীয় আয়াতের শেষ বাক্য। এতে কোরআন পাক এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা দিয়েছে, যা সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ। এর উপরই মানুষের সর্ব প্রকার মঙ্গল ও সাফল্য বরং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এ প্রশ্নটি হচ্ছে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা। জ্ঞানী মাত্রই জানে যে, এ বিশ্বের গোটা রক্ষা ব্যবস্থা মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একজন অন্যজনের সাহায্য না করে, তবে একাকী মানুষ হিসেবে সে যতই বুদ্ধিমান, শক্তিধর অথবা বিত্তশালী হোক, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র কিছুতেই সংগ্রহ করতে পারবে না। একাকী মানুষ স্বীয় খাদ্যের জন্যে শস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে আহারোপযোগী করা পর্যন্ত সব স্তর অতিক্রম করতে পারে না। এমনিভাবে পোশাক-পরিচ্ছদের জন্যে তুলা চাষ থেকে শুরু করে স্বীয় দেহের মানানসই পোশাক তৈরী করা পর্যন্ত অসংখ্য সমস্যার সমাধান করতে একাকী কোন মানুষ কিছুতেই সক্ষম নয়। মোটকথা, প্রত্যেকটি মানুষই জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অন্য হাজারো লাখো মানুষের মুখাপেক্ষী। তাদের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা দ্বারাই সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে। চিন্তা করলে দেখা যায়, এ সাহায্য ও সহযোগিতা পার্থিব জীবনের জন্যেই জরুরী নয়— মৃত্যু থেকে নিয়ে কবরে সমাহিত হওয়া পর্যন্ত সকল স্তরও এ সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। বরং এর পরও মানুষ জীবিতদের দোয়ায়ে-মাগফেরাত ও ইছালে-ছওয়াবের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে।

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় অসীম জ্ঞান ও পরিপূর্ণ ক্ষমতায় বিশ্বচরাচরের জন্যে এমন অটুট ব্যবস্থা রচনা করেছেন, যাতে একজন অন্যজনের মুখাপেক্ষী। দরিদ্র ব্যক্তি পয়সার জন্যে যেমন ধনীর মুখাপেক্ষী, তেমনি শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তিও পরিশ্রম ও মেহনতের জন্যে দিনমজুরের মুখাপেক্ষী। ব্যবসায়ী গ্রাহকের মুখাপেক্ষী এবং গ্রাহক ব্যবসায়ীর মুখাপেক্ষী। গৃহ নির্মাতা রাজমিস্ত্রী, কর্মকার, ছুতারের মুখাপেক্ষী এবং এরা সবাই গৃহনির্মাতার মুখাপেক্ষী। যদি এহেন সর্বব্যাপী মুখাপেক্ষিতা না থাকতো এবং সাহায্য-সহযোগিতা কেবল নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপরই নির্ভরশীল হতো, তবে কে কার কাজ করতে এগিয়ে আসতো। এমতাবস্থায় সাহায্য-সহযোগিতার দশাও তাই হতো, যা এ জগতে সাধারণ নৈতিক মূল্যবোধের হচ্ছে। যদি এ কর্মবন্টন কোন সরকার অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আইন আকারে করে দেওয়া হতো, তবে এর পরিণামও তাই হতো, যা আজকাল সারা বিশ্বে জাগতিক আইনের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অর্থাৎ, আইন খাতাপত্রে সংরক্ষিত আছে এবং বাজারে ও অফিস আদালতে ঘুষ, অন্যায় সুবিধাদান, কর্তব্যবিমুখতা ও কর্মহীনতার আইন চালু রয়েছে। একমাত্র সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার ব্যবস্থাপনাই বিভিন্ন মানুষের মনে বিভিন্ন কারবারের স্পৃহা ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

মোটকথা, সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনাও পারস্পরিক সম্পর্কের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এ চিত্রের একটা ভিন্ন পিঠও আছে। তা এই যে, যদি অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুন্ঠন ইত্যাদির জন্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা হতে থাকে, চোর ও ডাকাতদের বড় বড় সুশৃঙ্খল দল গঠিত হয়ে যায়, তবে এ সাহায্য ও সহযোগিতাই বিশ্বব্যবস্থাকে তছনছও করে দিতে পারে। এতে বোঝা গেল যে, পারস্পরিক সহযোগিতা একটি দুধারী তরবারি— যা নিজের উপরও চালিত হতে পারে এবং বিশ্বব্যবস্থাকেও বানচাল করতে পারে। এ বিশ্ব মঙ্গলামঙ্গল, ভালমন্দ এবং সৎ-অসতের আবাসভূমি। এ কারণে এতে এরূপ হওয়া অসম্ভব ছিল না। এখানে অপরাধ, হত্যা, লুন্ঠন ও কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও শক্তি ব্যবহৃত হতে পারত। এটা শুধু সম্ভাবনাই নয়; বরং বাস্তব আকারে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে উঠেছে। তাই এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিশ্বের জ্ঞানীগুণীরা স্বীয় হেফাযতের জন্যে বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ দল অথবা জাতির ভিত্তি স্থাপন করেছে— যাতে একদল অথবা একজাতির বিরুদ্ধে অন্য দল অথবা অন্য জাতি আক্রমনোদ্যত হলে সবাই মিলে পারস্পরিক সহযোগিতার শক্তি ব্যবহার করে তা প্রতিহত করতে পারে।

**জাতীয়তা বন্টন ঃ** আবদুল করিম শাহরেস্তানী প্রণীত 'মিলাল ওয়ান্‌নিহাল' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ প্রথম দিকে যখন পৃথিবীর জনসংখ্যা বেশী ছিল না, তখন বিশ্বের চার দিকের ভিত্তিতে চারটি জাতীয়তা জন্মলাভ করে ঃ প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, দক্ষিণ, উত্তর প্রত্যেক দিকে বসবাসকারীরা নিজেদেরকে এক জাতি এবং অন্যকে ভিন্ন জাতি মনে

করতে থাকে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হতে থাকে। এরপর যখন জনসংখ্যা বেড়ে যায়, তখন প্রত্যেক দিকের লোকদের মধ্যে বংশ ও গোত্রের ভিত্তিতে জাতীয়তার ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে। আরবের সমগ্র ব্যবস্থা এ বংশ ও গোত্রগত ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর ভিত্তিতেই যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হতো। বনূ হাশেম এক জাতি, বনূ তামীম অন্য জাতি এবং বনূ খোযায়াহ্ স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে বিবেচিত হতো। হিন্দুদের মধ্যে আজ পর্যন্ত উচ্চজাত ও নীচ জাতের ব্যবধান অব্যাহত রয়েছে।

আধুনিক ইউরোপীয়রা নিজেদের বংশ তো বিসর্জন দিয়েছেই, অন্যান্যদের রক্ত-ধারাকেও তারা মূল্যহীন প্রতিপন্ন করেছে। দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই তারা বংশগত ও গোত্রগত জাতীয়তা ও বিভাগকে নিশ্চিহ্ন করে আবার আঞ্চলিক, প্রাদেশিক, দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে মানবজাতিকে খন্ড-বিখন্ড করে পৃথক পৃথক জাতি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আজ প্রায় সারা বিশ্বেই ভাষা এবং অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা চালু হয়ে গেছে। এমনকি, মুসলমানরাও এ জাদুর পরশ থেকে মুক্ত নয়। আরবী, তুর্কী, ইরাকী,সিন্ধীর বিভাগই নয়; বরং তাদের মধ্যেই ভাগফলকে ভাগ করে মিসরী,সিরীয়, হেজাযী, নজ্দী এবং পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, সিন্ধী, হিন্দী ইত্যাদি পৃথক পৃথক জাতি জন্মলাভ করেছে। ইউরোপীয়রা এসবের ভিত্তিতেই সরকারী কাজ-কারবার পরিচালনা করেছে। ফলে আঞ্চলিকতা ভিত্তিক বিদ্বেষ জনগণের শিরা-উপশিরায় ঢুকে পড়েছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের জনগণ এর ভিত্তিতেই সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে।

**জাতীয়তা ও কোরআনী শিক্ষা ঃ** কোরআন পাক মানুষকে আবার ভুলে যাওয়া সবক স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। সূরা নেসার প্রথম আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা সব মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্বের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, কোন আরবের অনারবের উপর অথবা কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষাঙ্গের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। খোদাভীতি ও খোদার আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি। কোরআনের এ শিক্ষা إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই) ঘোষণা করে আবিসিনিয়ার কৃষ্ণাঙ্গকে লাল তুর্কী ও রোমীর ভাই এবং অনারব নীচ জাতের মানুষকে কোরায়শী ও হাশেমী আরবের ভাই করে দিয়েছে। জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি এভাবে রচনা করেছে যে, যারা আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূলকে মেনে চলে, তারা এক জাতি এবং যারা মানে না, তারা ভিন্ন জাতি। জাতীয়তার এ ভিত্তিই আবু জেহেল ও আবু লাহাবের পারিবারিক সম্পর্ক রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বেলাল হাবশী ও ছুহায়েব রোমীর সম্পর্ককে তাঁর সাথে জুড়ে দিয়েছে।

হাসান বসরা থেকে, বেলাল হাবাশা থেকে এবং ছুহাইব রোম থেকে এলেন অথচ মক্কার পবিত্র মাটি থেকে উঠলো আবু জেহেল. 'এটা কেমন আশ্চর্যজনক ব্যাপার' এমনকি, কোরআন পাক ঘোষণা করেছে ঃ

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছ— কিছু কাফের হয়ে গেছ এবং কিছু মুমিন। বদর, ওহুদ, আহযাব ও হোনায়নের যুদ্ধে কোরআনের এ বিভক্তি কার্যক্ষেত্রে বিকাশ লাভ করেছিল। বংশগত ভাই আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মুসলমান ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক তার সাথে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং সে তার তরবারির নীচে এসে গিয়েছিল। বদর ওহুদ ও খন্দকের ঘটনাবলী এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, যদি মুসলমান ভাইও ন্যায়ের বিরুদ্ধে এবং অন্যায় ও উৎপীড়নের পথে চলে, তবে অন্যায় কার্যে তারও সাহায্য করো না। বরং অন্যায় ও অত্যাচার থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কর। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এটাই তাকে বিশুদ্ধ সাহায্য—যাতে অন্যায় ও অত্যাচারের পাপে তার ইহকাল ও পরকাল বিনষ্ট না হয়।

কোরআন পাকের এ শিক্ষা সৎকর্ম ও খোদাভীতিকে আসল মাপকাঠি করেছে, তার উপরই মুসলিম জাতি জাতীয়তাবাদের প্রাচীর খাড়া করেছে এবং এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহবান জানিয়েছে। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্য-সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। এক্ষেত্রে بر ও تقوى দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। بر শব্দের অর্থ সাধারণ তফসীরকারগণের মতে সৎকর্ম এবং تقوى শব্দের অর্থ মন্দ কাজ বর্জন। اثم শব্দের অর্থ যে কোন পাপকর্ম-অধিকার সম্পর্কিত হোক অথবা এবাদত সম্পর্কিত। عدوان শব্দের অর্থ সীমা লঙ্ঘন করা। এখানে অর্থ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করা।

সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে সাহায্য করার জন্য রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ الدال على الخير كفاعله – অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোন সৎকর্মের পথ বলে দেয়, সে ততটুকু ছওয়াব পাবে, যতটুকু নিজে সৎকর্মটি করলে পেত।- (ইবনে-কাসীর)

সহীহ বুখারীর হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হেদায়েত ও সৎকর্মের প্রতি আহবান জানায়, তার আহবানে যতলোক সৎকর্ম করবে, সে তাদের সবার সমান ছওয়াব পাবে। এতে তাদের ছওয়াব হ্রাস করা হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অসৎকর্ম অথবা পাপের প্রতি আহবান করে, তার আহবানে যতলোক পাপকর্মে লিপ্ত হবে, তাদের সবার সমান গোনাহ তারও হবে। এতে তাদের গোনাহ্ হ্রাস করা হবে না।

ইবনে-কাসীর বর্ণিত তিবরানীর রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারীর সাথে তার সাহায্যার্থ বের হয়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়। এর ভিত্তিতেই পূর্ববর্তী মনীষীগণ অত্যাচারী বাদশাহর চাকুরী ও পদ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে বিরত রয়েছেন। কারণ, এতে অত্যাচারে সহায়তা করা হয়। রুহুল-মাআনীতে فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে এ হাদীস উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কেয়ামতের দিন ডাক দেয়া হবে—অত্যাচারী ও তাদের সাহায্যকারীরা কোথায় আছ? অতঃপর যারা অত্যাচারীদের দোয়াত-কলমও ঠিক করে দিয়েছে, তাদেরকেও একটি লৌহ শবাধারে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কোরআন ও সুন্নার এ শিক্ষাই জগতে সততা, ইনসাফ, সহানুভূতি ও সচ্চরিত্রতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিটি ব্যক্তিকে কর্মীরূপে প্রস্তুত করেছে এবং অপরাধ ও উৎপীড়ন দমনের জন্যে প্রতিটি ব্যক্তিকে এমন সিপাহীরূপে গড়ে তুলেছিল, যারা খোদাভীতির কারণে প্রকাশ্যে ও গোপনে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধ্য থাকে। এ বিজ্ঞজনোচিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুফল সাহাবী ও তাবেয়ীগণের যুগে জগদ্বাসী প্রত্যক্ষ করেছে। আজকালও কোন দেশে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে নাগরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যেককেই কিছু কিছু আত্মরক্ষার কৌশল শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু অপরাধবৃত্তি নিবারণের জন্যে জনগণকে সৎকাজের প্রতি আহবান প্রচেষ্টা কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا
بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾ يَسْأَلُونَكَ
مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ
مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤﴾
الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

*(৩) তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের মাংস, যেসব জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র জন্তু ভক্ষণ করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা যবেহ্ করেছ। যে জন্তু যজ্ঞবেদীতে যবেহ্ করা হয় এবং যা ভাগ্য নির্ধারক শর দ্বারা বন্টন করা হয়। এসব গোনাহ্‌র কাজ। আজ কাফেররা তোমাদের দ্বীন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর। আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম। অতএব যে ব্যক্তি তীব্র ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে; কিন্তু কোন গোনাহ্‌র প্রতি প্রবণতা না থাকে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমাশীল। (৪) তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি বস্তু তাদের জন্যে হালাল? বলে দিন ঃ তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হয়েছে। যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান কর শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্যে এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন শিকারী জন্তু যে শিকারকে তোমাদের জন্যে ধরে রাখে, তা খাও এবং তার উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ কর। আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ্ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। (৫) আজ তোমাদের জন্যে পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হল। আহ্‌লে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল। তোমাদের জন্যে হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর তাদেরকে স্ত্রী করার জন্যে, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে নয়। যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।*

এটা জানা কথা যে, সামরিক কুচকাওয়াজ ও নাগরিক প্রতিরক্ষার নিয়ম অনুযায়ী এ কাজের অনুশীলনী হয় না; বরং এ কাজ শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিতই নয়। আজকালকার সাধারণ শিক্ষাঙ্গন গুলোতে بر ও تقوى তথা সৎকর্ম ও খোদাভীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ এবং اثم ও عدوان তথা পাপ ও অত্যাচারের সকল পথ উন্মুক্ত। গোটা জাতিই যেখানে হালাল ও হারাম, ন্যায় ও অন্যায় ভুলে গিয়ে অপরাধপ্রবণ হয়ে যায়, সেখানে বেচারা পুলিশ কতদূর অপরাধ দমন করতে পারে? আজ সর্বত্র ও সবদেশে অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, অশ্লীলতা, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি রোগ রোজ রোজ বেড়েই চলেছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তা দমন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। বলাবাহুল্য, এর কারণ দু'টি ঃ এক, প্রচলিত সরকারগুলো কোরআনী ব্যবস্থা থেকে দূরে রয়েছে। ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা স্বীয় জীবনে بر ও تقوى সৎকর্ম ও খোদাভীতির মূলনীতি অনুসরণ করতে দ্বিধা বোধ করে – যদিও এর ফলশ্রুতিতে তাদের অসংখ্য দুঃখ ভোগ করতে হচ্ছে। আক্ষেপ, তারা যদি একবার পরীক্ষার জন্যেই এ তিক্ত ঢোক গিলে ফেলতো এবং খোদায়ী কুদরতের তামাশা দেখতো যে, কিভাবে তাদের এবং জনগণের জীবনে সুখ, শান্তি আরাম ও আনন্দের স্রোতধারা নেমে আসে!

দুই, জনগণ মনে করে নিয়েছে যে, অপরাধ প্রবণতা দমন করা একমাত্র সরকারের দায়িত্ব। শুধু তাই নয়, তারা পেশাদার অপরাধীদের অপরাধ গোপন করতেও সচেষ্ট থাকে। শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও অপরাধ দমন করার উদ্দেশে সত্য সাক্ষ্য দেওয়ার রীতিই দেশ থেকে উঠে গেছে। জনগণের বোঝা দরকার যে, অপরাধীর অপরাধ গোপন করা এবং সত্য সাক্ষ্যদানে বিরত থাকা অপরাধে সহায়তা করার নামান্তর। এটা কোরআনের আইনে হারাম ও কঠোর পাপ এবং আলোচ্য আয়াত وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ – এ বর্ণিত নির্দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য অংশটুকু সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াত। এতে অনেক মূলনীতি এবং শাখাগত বিধি-বিধান ও মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম মাসআলাটি হচ্ছে হালাল ও হারাম জন্তু সম্পর্কিত। যেসব জন্তুর মাংস মানুষের জন্যে শারীরিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন দেহে রোগসৃষ্টি হতে পারে; অথবা আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে ক্ষতিকর; যেমন চরিত্র ও অন্তরগত অবস্থা বিনষ্ট হতে পারে, কোরআন পাক সেগুলোকে অশুচি আখ্যা দিয়ে হারাম করেছে। পক্ষান্তরে যেসব জন্তুর মাংসে কোন শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি নাই, সেগুলোকে পবিত্র ও হালাল ঘোষণা করেছে।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের জন্যে মৃত জন্তু হারাম করা হয়েছে। 'মৃত' বলে ঐ জন্তু বুঝানো হয়েছে, যা যবেহ্ ব্যতীত কোন রোগে অথবা স্বাভাবিকভাবে মরে যায়। এধরনের মৃত জন্তুর মাংস চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও মানুষের জন্যে ক্ষতিকর এবং আধ্যাতিক দিক দিয়েও।

তবে হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) দুই প্রকার মৃতকে বিধানের বাইরে রেখেছেন; একটি মৃত মাছ ও অপরটি মৃত টিড্ডী। (মুসনাদে আহমদ,

ইবনে মাজাহ, দারেকুতনী, বায়হাকী)

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় হারাম বস্তু হচ্ছে রক্ত। কোরআনের অন্য আয়াতে أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا বলায় বুঝা যায় যে, যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই হারাম। সুতরাং কলিজা ও প্লীহা রক্ত হওয়া সত্ত্বেও হারাম নয়। পূর্বোক্ত যে হাদীসে মাছ ও টিড্ডীর কথা বলা হয়েছে, তাতেই কলিজা ও প্লীহা হালাল হওয়ার কথাও বলা হয়েছে।

তৃতীয় বস্তু শূকরের মাংস। একেও হারাম করা হয়েছে। মাংস বলে তার সম্পূর্ণ দেহ বুঝানো হয়েছে। চর্বি ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত।।

চতুর্থ ঐ জন্তু যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। যদি যবেহ্ করার সময়ও অন্যের নাম নেয়া হয়, তবে তা খোলাখুলি শিরক। এরূপ জন্তু সর্বসম্মতভাবে মৃতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আরবের মুশরেকরা মূর্তিদের নামে যবেহ্ করতো। অধুনা কোন কোন মূর্খ লোক পীর-ফকীরের নামে যবেহ্ করে। যদিও যবেহ্ করার সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে; কিন্তু জন্তুটি যেহেতু অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত এবং তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে কুরবানী করে, তাই সাধারণ ফেকাহ্বিদগণ একেও وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ আয়াত দৃষ্টে হারাম বলেছেন।

পঞ্চম منخنقة অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে অথবা নিজেই কোন জাল ইত্যাদিতে আবদ্ধ অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে গেছে।

ষষ্ঠ موقوذة অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা লাঠি অথবা পাথর ইত্যাদির প্রচন্ড আঘাতে নিহত হয়। যদি নিক্ষিপ্ত তীরের ধারাল অংশ শিকারের গায়ে না লাগে এবং তীরের আঘাতে শিকার নিহত হয়, তবে সে শিকারও موقوذة এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। منخنقة এবং ميتة উভয়টি موقوذة তথা মৃতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগে এগুলোকে জায়েয মনে করা হতো। এ কারণে আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আদী ইবনে হাতেম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন ঃ আমি মাঝে মাঝে চওড়া তীর দ্বারা শিকার করি। যদি এতে শিকার মরে যায়,তবে খেতে পারি কি না ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তীরের যে অংশ ধারাল নয়, যদি সে অংশের আঘাতে শিকার মরে যায়, তবে তা موقوذة এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তুমি খেতে পারবে না। আর যদি ধারাল অংশ শিকারের গায়ে লাগে এবং শিকারকে আহত করে, তবে তা খেতে পার। ইমাম জাসসাস 'আহ্কামুল-কোরআন' গ্রন্থে এ হাদীসটি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন। এরূপ শিকার হালাল হওয়ার জন্যে শর্ত এই যে, বিসমিল্লাহ্ বলে তীর নিক্ষেপ করতে হবে।

যে শিকার বন্দুকের গুলিতে মরে যায়, ফেকাহ্বিদগণ সেটাকেও موقوذة এর অন্তর্ভুক্ত করে হারাম বলেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলতেন ঃ المقتولة بالبندوقة تلك الموقوذة – অর্থাৎ বন্দুক দ্বারা যে জন্তুকে হত্যা করা হয়, তাই .... অতএব হারাম। (জাসসাস)। ইমাম আযম আবু হানীফা (রাহঃ) শাফেয়ী, মালেক প্রমুখ সবাই এ ব্যাপারে একমত। – (কুরতুবী)

সপ্তম متردية অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোন পাহাড়, টিলা, উঁচু দালানের উপর থেকে অথবা কূপে পড়ে মরে যায়। এ কারণেই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ যদি তুমি পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান কোন শিকারের প্রতি বিসমিল্লাহ্ বলে তীর নিক্ষেপ কর এবং তীরের আঘাতে সে নীচে পড়ে মরে যায়, তবে তা খেয়ো না। কারণ, এতে সম্ভাবনা আছে যে, শিকারটি তীরের আঘাতে না মরে নীচে পড়ে যাওয়ার কারণে মরে গেছে। এমতাবস্থায় তা الْمُتَرَدِّيَةُ –এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে কোন পাখিকে তীর নিক্ষেপ করার পর যদি সেটি পানীতে পড়ে যায়, তবে উহা খাওয়াও নিষিদ্ধ। কারণ, এখানেও পানিতে ডুবে যাওয়ার কারণে মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। – (জাসসাস)

অষ্টম نطيحة অর্থাৎ ঐ জন্তু হারাম, যা কোন সংঘর্ষে নিহত হয়। যেমন রেলগাড়ী, মোটর ইত্যাদির নীচে এসে মরে যায় অথবা কোন জন্তুর শিং-এর আঘাতে মরে যায়।

নবম ঐ জন্তু হারাম, যেটি কোন হিংস্র জন্তুর কামড়ে মরে যায়। উপরোক্ত নয় প্রকার হারাম জন্তুর বর্ণনা করার পর একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ – অর্থাৎ, এসব জন্তুর মধ্যে কোনটিকে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর যবেহ্ করতে পারলে হালাল হয়ে যাবে।

এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চার প্রকার জন্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না। কেননা, মৃত ও রক্তকে যবেহ্ করার সম্ভাবনা নাই এবং শূকর এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত জন্তু সত্তার দিক দিয়েই হারাম। এ দুটোকে যবেহ্ করা না করা উভয়ই সমান। এ কারণে হযরত আলী (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান বসরী, কাতাদাহ প্রমুখ পূর্ববর্তী মনীষীগণ এ বিষয়ে একমত যে, এ ব্যতিক্রম প্রথমোক্ত চারটি পরবর্তী পাঁচটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। অতএব আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এ পাঁচ প্রকার জন্তুর মধ্যে যদি জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং তদবস্থায়ই বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করে দেয়া হয়, তবে এগুলো খাওয়া হালাল হবে।

দশম, ঐ জন্তু হারাম, যাকে নুছুবের উপর যবেহ্ করা হয়। নুছুব ঐ প্রস্তরকে বলা হয়, যা কাবা গৃহের আশেপাশে স্থাপিত ছিল। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা এদের উপাসনা করত এবং এদের কাছে এদের উদ্দেশে জন্তু কোরবানী করত ! একে তারা এবাদত বলে গণ্য করত।

জাহেলিয়াত যুগের আরবরা উপরোক্ত সব প্রকার জন্তুর মাংস ভক্ষণে অভ্যস্ত ছিল। কোরআন পাক এগুলোকে হারাম করেছে।

একাদশ استقسام بالأزلام হারাম। ازلام শব্দটি زلم এর বহুবচন। এর অর্থ ঐ তীর, যা জাহেলিয়াত যুগে ভাগ্য পরীক্ষার জন্যে নির্ধারিত ছিল। এ কাজের জন্যে সাতটি তীর ছিল। তন্মধ্যে একটিতে نعم (হাঁ), একটিতে لا (না) এবং অন্যগুলোতে অন্য শব্দ লিখিত ছিল। এ তীরগুলো কাবাগৃহের খাদেমের কাছে থাকত। কেউ নিজ ভাগ্য পরীক্ষা করতে চাইলে অথবা কোন কাজ করার পূর্বে তা উপকারী হবে না অপকারী, তা জানতে চাইলে সে কা'বার খাদেমের কাছে পৌঁছে একশত মুদ্রা উপঢৌকন দিত। খাদেম তূন থেকে একটি একটি করে তীর বের করত। 'হাঁ' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হয়ে আসলে মনে করা হত যে, কাজটি উপকারী। পক্ষান্তরে 'না' শব্দ বিশিষ্ট তীর বের হলে তারা বুঝে নিত যে, কাজটি করা ঠিক হবে না। হারাম জন্তুসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে এ বিষয়টি উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা এ তীরগুলো জন্তুসমূহের মাংস বন্টনেও ব্যবহার করত। কয়েকজন শরীক হয়ে উট ইত্যাদি যবেহ্ করে তা মাংস প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী বন্টন না করে এসব জুয়ার তীরের সাহায্যে বন্টন করত। ফলে কেউ সম্পূর্ণ বঞ্চিত, কেউ প্রাপ্য অংশের চাইতে কম এবং কেউ অনেক বেশী মাংস পেয়ে যেত। এ কারণে হারাম জন্তুর বর্ণনা প্রসঙ্গে এ হারাম বন্টন পদ্ধতিও বর্ণনা করা হয়েছে।

**আলেমগণ বলেন ঃ** ভবিষ্যৎ অবস্থা এবং অদৃশ্য বিষয় জানার যেসব পন্থা প্রচলিত আছে; যেমন ভবিষ্যৎ কথন বিদ্যা, হস্তরেখা বিদ্যা, শকুন বিদ্যা ইত্যাদি সব استقسام بالازلام এর অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম।

استقسام بالازلام শব্দটি কখনও জুয়া অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যাতে গুটিকা নিক্ষেপ অথবা লটারীর নিয়মে অধিকার নির্ধারণ করা হয়। কোরআন পাক একে ميسر নাম দিয়ে হারাম ও নিষিদ্ধ করেছে। এ কারণেই হযরত ছায়ীদ ইবনে জুবায়র, মুজাহিদ ও শা'বী (রাঃ) বলেনঃ আরবে যেমন ভাগ্য নির্ধারক তীরের সাহায্যে অংশ বের করা হত পারস্য ও রোমেও তেমনি আবার ছক, চওসর ইত্যাদির গুটি দ্বারা অংশ বের করা হত। সুতরাং তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে নির্দ্ধারণের ন্যায় এগুলোও হারাম। — (মাযহারী)

ভাগ্য নির্ধারক তীর দ্বারা বন্টন হারাম করার সাথে সাথে বলা হয়েছে ঃ ذٰلِكُمْ فِسْقٌ —অর্থাৎ, এ বন্টন পদ্ধতি পাপাচার ও পথভ্রষ্টতা। এরপর বলা হয়েছেঃ

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ

অর্থাৎ, অদ্য কাফেররা তোমাদের দ্বীনকে পরাভূত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে আর ভয় করো না। তবে আল্লাহ্কে ভয় কর।

এ আয়াতটি হিজরতের দশম বৎসরে বিদায় হজ্বের আরাফার দিনে অবতীর্ণ হয়। তখন মক্কা এবং প্রায় সমগ্র আরব মুসলমানদের করতলগত ছিল। সমগ্র আরব উপত্যকায় ইসলামী আইন প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বলা হয়েছে ঃ ইতিপূর্বে কাফেররা মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি অপেক্ষকৃত কম দেখে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পরিকল্পনা করতো। কিন্তু এখন তাদের মধ্যে এরূপ দুঃসাহস ও বল-ভরসা নাই। এ কারণে মুসলমানরা তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত হয়ে স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্য ও এবাদতে মানোনিবেশ করুক।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

এ আয়াতটি অবতরণের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। আরাফার দিন। এ দিনটি পূর্ণ বৎসরের মধ্যে সর্বোত্তম দিন। ঘটনাক্রমে এ দিনটি পড়েছিল শুক্রবারে। এর শ্রেষ্ঠত্বও সর্বজনবিদিত। স্থানটি হচ্ছে ময়দানে-আরাফাতের 'জবলে-রহমত, (রহমতের পাহাড়) এর সন্নিকট। এ স্থানটিই আরাফার দিনে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত অবতরণের বিশেষ স্থান। সময় আছরের পর—যা সাধারণ দিনগুলোতেও বরকতময় সময়। বিশেষতঃ শুক্রবার দিনে। অনেক রেওয়ায়েত দৃষ্টে এ দিনের এ সময়েই দোয়া কবুলের মুহূর্তটি ঘনিয়ে আসে। আরাফার দিনে আরও বেশী বৈশিষ্ট্য সহকারে দোয়া কবুলের সময়।

হজ্বের জন্যে মুসলমানদের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ ঐতিহাসিক সমাবেশ। প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবায়ে-কেরাম উপস্থিত। রাহমাতুল্লিল-আলামীন সাহাবায়ে-কেরামের সাথে জবলে-রহমতের নীচে স্বীয় উষ্ট্রী আযবার পিঠে সওয়ার। সবাই হজ্বের প্রধান রোকন অর্থাৎ, আরাফাতের ময়দানে অবস্থানরত।

এসব শ্রেষ্ঠত্ব, বরকত ও রহমতের ছত্রছায়ায় উল্লেখিত পবিত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। সাহাবায়ে-কেরাম বর্ণনা করেন ঃ যখন হযরত রসূলে করীম (সাঃ) — এর উপর ওহীর মাধ্যমে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, তখন নিয়মানুযায়ী ওহীর গুরুভার সহ্য করতে না পেরে উষ্ট্রি ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এ আয়াত কোরআনের শেষ দিককার আয়াত। এরপর বিধি-বিধান সম্পর্কিত আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। বলা হয় যে, শুধু উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনমূলক কয়েকখানি আয়াত-এর পর নাযিল হয়েছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মাত্র একাশি দিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন। কেননা, দশম হিজরীর ৯ই যিলহজ্ব তারিখে এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখে হযরত রসূলে করীম (সাঃ) ওফাত পান।

এ আয়াত যেমন বিশেষ তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহকারে অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি এর বিষয়বস্তুও ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের জন্যে বিরাট সুসংবাদ, অনন্য পুরস্কার ও স্বাতন্ত্রের স্বাক্ষর বহন করে। এ বিষয়বস্তুর সারমর্ম এই যে, পৃথিবীতে মানব জাতিকে সত্য দ্বীন ও খোদায়ী নেয়ামতের চূড়ান্ত মাপকাঠি প্রদানের যে ওয়াদা ছিল, আজ তা ষোলকলায় পূর্ণ করে দেয়া হলো। হযরত আদম (আঃ) — এর আমল থেকে যে সত্যধর্ম ও খোদায়ী নেয়ামতের অবতরণ ও প্রচলন আরম্ভ করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক ভূখণ্ডের অবস্থানুযায়ী এ নেয়ামত থেকে আদম সন্তানদের অংশ দেয়া হচ্ছিল, আজ যেন সেই ধর্ম ও নেয়ামত পরিপূর্ণ আকারে শেষনবী মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতকে প্রদান করা হল।

উপরোক্ত প্রশ্নোত্তরে শিকারী কুকুর, বাজ ইত্যাদি দ্বারা শিকার করা জন্তু হালাল হওয়ার জন্যে চারটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম, কুকুর অথবা বাজ শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে। শিকার পদ্ধতি এই যে, আপনি যখন কুকুরকে শিকারের দিকে প্রেরণ করবেন, তখন সে শিকার ধরে আপনার কাছে নিয়ে আসবে— নিজে খাওয়া শুরু করবে না। বাজপক্ষীর বেলায় পদ্ধতি এই যে, আপনি ফেরৎ আসার জন্যে ডাক দেয়া মাত্রই সে কাল বিলম্ব না করে ফিরে আসবে— যদিও তখন কোন শিকারের পিছনে ধাওয়া করতে থাকে। শিকারী জন্তু এমনভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে গেলে বোঝা যাবে যে, সে আপনার জন্যে শিকার করে নিজের জন্যে নয়। এমতাবস্থায় এগুলোর ধরে আনা শিকার স্বয়ং আপনারই শিকার বলে গণ্য হবে। যদি শিকারী জন্তু কোন সময় এ শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করে যেমন, কুকুর নিজেই খাওয়া আরম্ভ করে কিংবা বাজপাখী আপনার ডাকে ফেরৎ না আসে, তবে এ শিকার আপনার শিকার নয়। কাজেই তা খাওয়াও বৈধ নয়।

দ্বিতীয়, আপনি নিজ ইচ্ছায় কুকুরকে অথবা বাজকে শিকারের পেছনে প্রেরণ করবেন। কুকুর অথবা বাজ যেন স্বেচ্ছায় শিকারের পেছনে দৌড়ে শিকার না করে। আলোচ্য আয়াতে এ শর্তটি مُكَلِّبِيْنَ শব্দে বর্ণিত হয়েছে। এটি تكليب ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর আসল অর্থ কুকুরকে শিক্ষা দেয়া। এরপর সাধারণ শিকারী জন্তুকে শিক্ষা দেয়ার পর শিকারের দিকে প্রেরণ করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। জালালাইন- এর গ্রন্থকার مُكَلِّبِيْنَ শব্দের ব্যাখ্যায় ارسال শব্দ উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ শিকারের দিকে প্রেরণ করা। তফসীরে কুরতুবীতেও এ উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় শর্ত এই যে, শিকারী জন্তু নিজে শিকারকে খাবে না; বরং আপনার কাছে নিয়ে আসবে। এ শর্তটি مِمَّا اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ বাক্যাংশে

বর্ণিত হয়েছে।

চতুর্থ শর্ত এই যে, শিকারী কুকুর অথবা বাজকে শিকারের দিকে প্রেরণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বলতে হবে। বর্ণিত চারটি শর্ত পূর্ণ হলে শিকার আপনার হাতে পৌঁছার পূর্বেই যদি মরে যায়, তবুও তা হালাল হবে; যবেহ্ করার প্রয়োজন হবে না। আর যদি জীবিত অবস্থায় হাতে আসে, তবে যবেহ্ ব্যতীত হালাল হবে না।

ইমাম আযম আবু হানীফা (রাঃ)–এর মতে একটি পঞ্চম শর্তও আছে। তা এই যে, শিকারী জন্তু শিকারকে আহতও করতে হবে। جوارح শব্দে এ শর্তের প্রতিই ইঙ্গিত রয়েছে।

যেসব বন্য জন্তু কারও করতলগত নয়, উপরোক্ত মাছআলা তাদের বেলায় প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে কোন বন্য জন্তু কারও করতলগত হয়ে গেলে, তা নিয়মিত যবেহ্ করা ব্যতীত হালাল হবে না।

উপসংহারে এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা শিকার করা জন্তু হালাল করেছেন ঠিক, কিন্তু শিকারের পেছনে লেগে নামায ও শরীয়তের অন্যান্য জরুরী নির্দেশের প্রতি উদাসীন হয়ে পড়া কিছুতেই বৈধ নয়।

সূরা মায়েদার প্রথম আয়াতে গৃহপালিত পশু ছাগল, গরু, মহিষ ইত্যাদির হালাল হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং তৃতীয় আয়াতে নয় প্রকার হারাম জন্তুর বিবরণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতের বিবরণে প্রথম বাক্যেই গোটা অধ্যায়ের সারমর্ম এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে, যাতে বিভিন্ন জন্তুর মধ্যে হালাল ও হারাম হওয়ার বৈশিষ্ট্যসহ এর একটি মাপকাঠি ও মূলনীতি সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়।

এরশাদ হচ্ছে اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ – অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্যে সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল করা হল। 'আজ' বলে এ দিনকে বোঝানো হয়েছে, যেদিন এ আয়াত ও এর পূর্ববর্তী আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ, দশম হিজরীর বিদায় হজ্বের আরাফার দিন। উদ্দেশ্য এই যে, আজ যেমন তোমাদের জন্যে তামাদের ধর্মকে পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বস্তুসমূহ, যা পূর্বেও তোমাদের জন্যে হালাল ছিল, চিরস্থায়ীভাবে হালাল রাখা হল। এ নির্দেশ রহিত হওয়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে। কেননা, অচিরেই ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এ আয়াতে طيبات অর্থাৎ, পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ হালাল করেন তাদের জন্যে طيبات এবং হারাম করেন خبائث এখানে طيبات – এর বিপরীতে خبائث ব্যবহার করে উভয় শব্দের মর্মার্থ বর্ণনা করা হয়েছে।

অভিধানে طيبات পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাম্য বস্তুসমূহকে এবং এর বিপরীতে خبائث নোংরা ও ঘৃণার্হ বস্তুসমূহকে বলা হয়। কাজেই আয়াতের এ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, যেসব বস্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও পবিত্র, সেগুলো মানুষের জন্যে হালাল করা হয়েছে এবং যেসব বস্তু নোংরা,ঘৃণার্হ ও অপকারী, সেগুলো হারাম করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, জগতে মানব জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের ন্যায় খাওয়া-পরা, নিদ্রা-জাগরণ ও জীবন-মরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কোন বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সে লক্ষ্যটি উত্তম ও পবিত্র চরিত্র ব্যতিত অর্জিত হতে পারে না। এ কারণেই অসচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষ আখ্যা লাভের যোগ্য নয়।

কোরআন পাক এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলে ঃ بَلْ هُمْ اَضَلُّ – অর্থাৎ, এরা চতুষ্পদ জন্তুর চাইতেও অধিকতর পথভ্রষ্ট। যখন চরিত্র সংশোধনের উপর মানবের মানবতা নির্ভরশীল, তখন যেসব বস্তু মানব চরিত্রকে কলুষিত ও বিনষ্ট করে, সেগুলো থেকে মানুষকে পুরোপুরিভাবে বাঁচিয়ে রাখা অত্যাবশ্যক। একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, মানব চরিত্রের উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অতএব, একথা সুস্পষ্ট যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা যখন মানব চরিত্র প্রভাবান্বিত হয়, তখন যে বস্তু মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়, তার দ্বারা মানব চরিত্র অবশ্যই প্রভাবান্বিত হবে। এ কারণে পানাহারের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরী। চুরি, ডাকাতি, ঘুষ, সূদ, জুয়া ইত্যাদির আমদানী যে ব্যক্তির শরীরের অংশ হবে, সে নিশ্চিত রূপেই মানবতা থেকে দূরে সরে পড়বে এবং শয়তানের নিকটবর্তী হয়ে যাবে।

এ কারণেই কোরআন পাক বলে ঃ يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا – এখানে সৎকর্মের জন্যে হালাল ভক্ষণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, হালাল ভক্ষণ ব্যতীত সৎকর্ম কল্পনাতীত।

বিশেষ করে মাংস মানব দেহের প্রধান অংশে পরিণত হয়। সুতরাং যে মাংস চরিত্র বিনষ্ট করে, তা যাতে মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টিরাখা অধিকতর জরুরী। এমনিভাবে সে মাংস থেকেও বিরত থাকতে হবে, যা দৈহিক দিক দিয়ে মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। কেননা, এতে রোগ-ব্যাধির জীবাণু থাকে। শরীয়ত যেসব বস্তুকে নোংরা ও ঘৃণার্হ সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো নিশ্চিতরূপেই মানুষের দেহ কিংবা আত্মা অথবা উভয়কে বিনষ্ট করে এবং মানুষের প্রাণ অথবা চরিত্রকে ধ্বংস করে। এ কারণে সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে। এর বিপরীতে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বস্তু দ্বারা মানুষের দেহ ও আত্মা লালিত হয় এবং উৎকৃষ্ট চরিত্র গঠিত হয়। এ কারণে এগুলো হালাল করা হয়েছে। মোটকথা اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ বাক্যটি হালাল ও হারাম হওয়ার দর্শন এবং মূলনীতিও ব্যক্ত করেছে।

এখন কোন্ কোন্ বস্তু طيبات অর্থাৎ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উপাদেয় ও কাম্য এবং কোন্ কোন্ বস্তু خبائث অর্থাৎ, নোংরা ক্ষতিকর ও ঘৃণার্হ, তা সুস্থ রুচিজ্ঞানের আগ্রহ ও অনীহার উপরই নির্ভরশীল। এ কারণেই যেসব জন্তুকে ইসলাম হারাম সাব্যস্ত করেছে, প্রতিযুগের সুস্থ স্বভাব মানুষই সেগুলোকে নোংরা ও ঘৃণার্হ মনে করে এসেছে। যেমন, মৃতজন্তু, রক্ত ইত্যাদি। তবে মাঝে মাঝে মূর্খতাসুলভ রীতিনীতি সুস্থ স্বভাবের উপর প্রবল হয়ে যায়। ফলে ভাল ও মন্দের পার্থক্য লোপ পায় অথবা কোন কোন বস্তুর নোংরামিও অস্পষ্ট হয়ে থাকে। এ ধরনের ব্যাপারে পয়গম্বরদের সিদ্ধান্ত সবার জন্যে অকাট্য দলীলস্বরূপ। কেননা, মানুষের মধ্যে পয়গম্বরগণই সর্বাধিক সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন। আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষভাবে তাঁদেরকে সুস্থ স্বভাব দ্বারা ভূষিত করেছেন। স্বয়ং তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়েছেন। তাদের চার দিকে ফেরেশতাদের পাহারা বসিয়েছেন। ফলে তাদের মন-মস্তিষ্ক ও চরিত্র কোন ভ্রান্ত পরিবেশ দ্বারা দূষিত হতে পারে না। তাঁরা যেসব বস্তুকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আখ্যা

দিয়েছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

অতএব, নূহ্ (আঃ) – এর আমল থেকে শেষনবী (সাঃ) – এর আমল পর্যন্ত প্রত্যেক পয়গম্বর মৃত জন্তু ও শূকর ইত্যাদিকে নিজেদের সময়ে হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রতি যুগের সুস্থ-স্বভাব মনীষীরা এদের নোংরা ও ক্ষতিকর বলেই মনে করেছেন।

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী (রাঃ) 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' গ্রন্থে বলেন, ইসলামী শরীয়তে হারামকৃত জন্তুদের সম্পর্কে চিন্তা করলে সেগুলো দুটি মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এক প্রকার জন্তু সৃষ্টিগত ও স্বভাবগতভাবে নোংরা ও অপবিত্র এবং দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর যবেহ পদ্ধতি ভ্রান্ত, ফলে যবেহ্-করা জন্তুর পরিবর্তে মৃত বলেই সাব্যস্ত করা হবে।

সূরা মায়েদার তৃতীয় আয়াতে নয়টি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। তন্মধ্যে শূকর প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং অবিশষ্ট আটটি দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

কোরআন পাক وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ বলে সংক্ষেপে সব নোংরা ও অপবিত্র জন্তু হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। অতঃপর শূকরের মাংস, প্রবাহিত রক্ত ইত্যাদি কয়েকটি বস্তুর নাম পরিষ্কার উল্লেখ করেছে। অবশিষ্ট নোংরা ও অপবিত্র বস্তুসমূহের বর্ণনা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর দায়িত্বে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি কোন জন্তুর خبيث তথা নোংরা হওয়ার আলামত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ কোন জাতিকে শাস্তি হিসেবে কোন জন্তুর আকৃতিতে বিকৃত ও রূপান্তরিত করা হলে বোঝা যায় যে, জন্তুটি স্বভাবগতভাবে নোংরা। ফলে যারা আল্লাহ্র গযবে পতিত, তাকে সেসব জীবের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দেয়া হয়েছে। উদাহরণতঃ কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

অর্থাৎ, কোন কোন জাতিকে শাস্তি হিসেবে শূকর ও বানরের আকৃতিতে বিকৃত করা হয়েছে। অতএব, বোঝা যায় যে, এই দুই প্রকার জন্তু স্বভাবগতভাবেই নোংরা শ্রেণীভুক্ত। নিয়মিত যবেহ্ করলেও এগুলো হালাল হবে না। এছাড়া অনেক জন্তু এমনও আছে, ক্রিয়াকর্ম ও লক্ষণাদি দ্বারা সেগুলো নোংরা হওয়ার বিষয় প্রত্যেকেই অনুভব করতে পারে। উদাহরণতঃ হিংস্র জন্তু। অন্যান্য জন্তুকে ক্ষত-বিক্ষত করা, ছিঁড়ে-খামচে ভক্ষণ করা এবং নির্মমতাই এদের কাজ।

এজন্যেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি সাধারণ নীতি হিসেবে বর্ণনা করেন যে, দাঁত দ্বারা ছিঁড়ে খায় এমন যাবতীয় হিংস্র জন্তু যেমন, সিংহ, বাঘ ইত্যাদি এবং থাবা দ্বারা শিকার করে এমন প্রত্যেক পাখী যেমন বাজ, চিল প্রভৃতি সবই হারাম। এছাড়া ইঁদুর, মৃতভোজী জন্তু, গাধা ইত্যাদির স্বভাব হচ্ছে হীনতা, নিকৃষ্টতা ও অপবিত্রতার সাথে জড়িত হওয়া। এসব জন্তুর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং ক্ষতিকর হওয়া প্রত্যেক সাধারণ সুস্থ-স্বভাব ব্যক্তিই অনুভব করতে সক্ষম।

মোটকথা এই যে, ইসলামী শরীয়ত যেসব জন্তুকে হারাম সাব্যস্ত করেছে, তন্মধ্যে এক প্রকার জন্তুর মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই নোংরামি পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার জন্তুর মাঝে প্রকৃতিগতভাবে কোন নোংরামি নাই; কিন্তু জন্তু যবেহ্ করার যে পদ্ধতি আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন তাকে সে পদ্ধতিতে যবেহ্ করা হয়নি। এখন এর ধরন বিভিন্ন হতে পারে ঃ (এক) মূলতঃ যবেহ্ই করা হয়নি। যেমন, হেঁচকা টান মেরে ফেলা, আঘাত করে মারা ইত্যাদি। (দুই) যবেহ করা হয়েছে ; কিন্তু আল্লাহ্র নামের পরিবর্তে অন্যের নাম নিয়ে। (তিন) কারও নাম নেয়া হয়নি এবং যবেহ্ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়নি। এরূপ যবেহ্ শরীয়তে ধর্তব্য নয়; বরং যবেহ ব্যতীত মেরে ফেলারই শামিল।

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্যে হালাল এবং তোমাদের খাদ্য আহলে কিতাবদের জন্যে হালাল।

এক্ষেত্রে সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়িগণের মতে 'খাদ্য' বলতে যবেহ্ করা জন্তুকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবুদ্দারদা, ইবরাহীম, কাতাদাহ্, সুদ্দী, যাহ্হাক, মুজাহিদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে এ কথাই বর্ণিত আছে।— (রুহুল মা'আলী, জাস্সাস) কেননা, অন্য প্রকার খাদ্যবস্তুতে আহ্লে-কিতাব, পৌত্তলিক, মুশরেক সবাই সমান। রুটি, আটা, চাল, ডাল ইত্যাদিতে যবেহ্ করার প্রয়োজন নেই। এগুলো যে কোন লোকের কাছ থেকে যে কোন বৈধ পন্থায় অর্জিত হলে মুসলমানের জন্যে খাওয়া হালাল। অতএব, আলোচ্য বাক্যের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আহ্লে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তু মুসলামনদের জন্যে এবং মুসলমানদের যবেহ্ করা জন্তু আহ্লে-কিতাবদের জন্যে হালাল।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম, কোরআন ও সুন্নাহ্র পরিভাষায় আহ্লে কিতাব কারা? কিতাব বলে কোন্ কিতাবকে বোঝানো হয়েছে? আহ্লে-কিতাব হওয়ার জন্যে স্বীয় কিতাবের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান থাকা এবং আমল করাও জরুরী কি না? এটা জানা কথা যে, এ স্থলে কিতাবের আভিধানিক অর্থে যে কোন লিখিতপাতাকে বোঝানো হয়নি, বরং যে কিতাব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগমন করেছে , তাই বোঝানো হয়েছে। তাই এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই যে, এখানে ঐ ঐশী কিতাবকেই বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ্র কিতাব হওয়া কোরআনের সমর্থন দ্বারা নিশ্চিত। যেমন, তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর, মূসা ও ইবরাহীম (আঃ)-এর ছহীফা ইত্যাদি। সুতরাং যেসব জাতি এমন কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাকে খোদায়ী প্রত্যাদেশ বলে মনে করে তারাই আহ্লে কিতাব। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র কিতাব বলে কোরআন ও সুন্নাহ্র নিশ্চিত পন্থায় প্রমাণিত নয়, তারা আহ্লে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন মক্কার মুশরেক, অগ্নিউপাসক, মূর্তিপূজারী হিন্দু, বৌদ্ধ, আর্য, শিখ ইত্যাদি। এতে বোঝা গেল যে, কোরআনের পরিভাষায় ইহুদী ও খ্রীস্টান জাতিই আহ্লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তারা তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রতি বিশ্বাসী।

তৃতীয় একটি জাতি হচ্ছে 'ছাবেয়ীন'। তাদের অবস্থা সন্দেহযুক্ত।

যেসব আলেমের মতে তারা দাউদ (আঃ)-এর কিতাব যবুরের প্রতি ঈমান রাখে, তাঁরা তাদেরও আহ্লে-কিতাবের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন। আর যারা অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, যবুর কিতাবের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই; এরা তারকা উপাসক জাতি, তারা এদের মূর্তি ও অগ্নিউপাসকদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন। মোটকথা, নিশ্চিতরূপে যাদের আহ্লে-কিতাব বলা যায় তারা হল ইহুদী ও খ্রীস্টান জাতি। তাদের যবেহ করা জন্তু মুসলমানদের জন্যে এবং মুসলমানদের যবেহ্ করা জন্তু তাদের জন্যে হালাল।

**ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে যারা নাস্তিক, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয় ঃ** আজকাল ইউরোপে বিরাট সংখ্যক ইহুদী ও খ্রীষ্টান রয়েছে, যারা শুধু আদম শুমারীর দিক দিয়েই ইহুদী ও খ্রীষ্টান বলে কথিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও কোন ধর্মে বিশ্বাস করে না, তওরাত ও ইঞ্জিলকে আল্লাহ্‌র গ্রন্থ মনে করে না এবং মূসা ও ইসা (আঃ)-কে আল্লাহর নবী ও পয়গম্বর বলে স্বীকার করে না। সুতরাং এটা জানা কথা যে, এরূপ ব্যক্তি আদম শুমারীর নামের কারণে আহ্‌লে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

**'আহ্‌লে কিতাবের খাদ্য' বলে কি বোঝানো হয়েছে ঃ** طعام শব্দের আভিধানিক অর্থ, খাদ্য দ্রব্য। শাব্দিক অর্থে সর্বপ্রকার খাদ্যই এর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সাধারণ আলেমদের মতে এ স্থলে طعام বলে শুধু আহ্‌লে কিতাবদের যবেহ করা গোশত বোঝানো হয়েছে। কেননা, গোশত ছাড়া অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে আহ্‌লে কিতাব ও অপরাপর কাফেরদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কাফেরদের হাতের আহার্য বস্তু গম, বুট, চাউল, ফল ইত্যাদি খাওয়া হালাল। এতে কারও দ্বিমত নেই। তবে যেসব খাদ্য মানুষের হাতে প্রস্তুত হয়, সেগুলোর ব্যাপারে যেহেতু কাফেরদের বাসন-কোসন ও হাতের পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেহেতু তা থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। কিন্তু এতে মুশরেক মূর্তিপূজারীর যে অবস্থা, আহ্‌লে কিতাবদেরও একই অবস্থা। কারণ, অপবিত্রতার সম্ভাবনা উভয় ক্ষেত্রেই সমান।

**আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ্ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ ঃ** এটি আলোচ্য বিষয়বস্তুর তৃতীয় প্রশ্ন। এর উত্তর অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তফসীরবিদের পক্ষ থেকে এই দেয়া হয় যে, কাফেরদের মধ্য থেকে আহ্‌লে কিতাব ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের যবেহ করা জন্তু হালাল হওয়া এবং তাদের মহিলাকে বিবাহ করা হালাল হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ দুটি বিষয়ে তাদের ধর্মমতও ইসলামের হুবহু অনুরূপ। অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে জন্তু যবেহ করাকে তারাও বিশ্বাসগতভাবে জরুরী মনে করে। এ ছাড়া মৃত জন্তুকেও তারা হারাম মনে করে।

এমনিভাবে ইসলামে যেসব মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, তাদের ধর্মেও তাদের বিবাহ করা হরাম। ইসলামে যেমন বিবাহ প্রচার করা ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হওয়া জরুরী, তেমনি তাদের ধর্মেও এসব বিধি বিধান জরুরী।

আহ্‌লে-কিতাবদের যবেহ করা জন্তু হালাল হওয়ার কারণ এই যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মে অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও যবেহ করার মাসআলাটি ইসলামী শরীয়তের অনুরূপ রয়েছে। আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা জন্তুকে তারাও হারাম মনে করে এবং যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা জরুরী মনে করে।

মোটকথা, পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে যারা আহ্‌লে-কিতাবদের আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে যবেহ্ করা জন্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, তাদের মতেও আহ্‌লে-কিতাবদের আসল মাযহাবে এরূপ জন্তু হারাম। কিন্তু তাঁরা বিভ্রান্ত লোকদেরকেও আসল আহ্‌লে-কিতাবদের সাথে এক করে তাদের যবেহ করা জন্তুকেও হালাল বলেছেন। পক্ষান্তরে সাধারণ সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ ইমামগণ এ দিকটি লক্ষ্য করেছেন যে, আহ্‌লে কিতাবদের মূর্খ জনগণ যে আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্যের নামে অথবা আল্লাহ্‌র নাম ব্যতীতই যবেহ করে, তা যেমন ইসলামী বিধানের পরিপন্থী, তেমনি স্বয়ং খ্রীষ্টানদের বর্তমান ধর্মমতেরও বিরোধী। এ কারণে ধর্মীয় বিধানের উপর তাদের কর্মের কোন প্রতিক্রিয়া না হওয়া উচিত। তাঁরা ফায়সালা দিয়েছেন যে, তাদের যবেহ করা জন্তু আয়াতে বর্ণিত আহ্‌লে -কিতাবদের যবেহ করা জন্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তা হালাল হওয়ার কোন কারণ নাই। তাদের ভ্রান্ত কর্মের কারণে কোরআনের আয়াতে নসখ তথা রহিতকরণের পথ বেছে নেয়া কিছুতেই সমীচীন নয়।

এ কারণেই ইবনে জরীর, ইবনে কাছীর, আবু হাইয়্যান প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, সূরা বাক্বারা ও সূরা আনআমের আয়াতসমূহে কোন নসখ হয়নি। এটাই সাধারণ সাহাবী ও তাবেয়ীদের মত। ইবনে কাছীরের বরাত দিয়ে পূর্বেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ মতই বাহরে-মুহীত গ্রন্থে নিম্নোক্ত ভাষায় উল্লেখিত হয়েছে ঃ

ذهب الى ان الكتابى اذا لم يذكر الله على الذبيحة وذكر غير الله لم تؤكل وبه قال ابوالدرداء وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة- وبه قال ابو حنيفة وابويوسف ومحمد وزفر ومالك وكره النخعى والثورى اكل ماذبح واهل به لغير الله-

– "তাঁর মাযহাব এই যে, আহ্‌লে-কিতাব যদি যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ না করে, অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে, তবে তা খাওয়া জায়েয নয়। আবুদ্দারদা, ওবাদা ইবনে ছামেত এবং একদল ছাহাবী এ কথাই বলেন এবং ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মোহাম্মদ, যুফার ও ইমাম মালেকের মতও তাই। নাখায়ী ও সওরী এরূপ জন্তুকে খাওয়া মকরূহ মনে করেন।" – (বাহ্‌রে মুহীত, ৪৩১ পৃঃ, ৪র্থ খণ্ড)

বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত আজকালকার তওরাত ও ইঞ্জীল থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিসমূহ দেখুন। বর্তমান যুগের ইহুদী ও খ্রীষ্টান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে স্বীকৃত বাইবেলের প্রাচীন আহাদনামায় যবেহ সম্পর্কে এসব বিধি-বিধান রয়েছে ঃ

(১) যে জন্তু আপনা আপনি মরে যায় এবং যেসব জন্তুকে অন্য কোন হিংস্র প্রাণী ছিঁড়ে ফেলে, তার চর্বি অন্য কাজে লাগালে লাগাতে পারে; কিন্তু কোন অবস্থাতেই তা খেতে পারবে না। (আহবারে – ২৪)

(২) যে কোন পন্থা-প্রক্রিয়ায় মনের আগ্রহে এবং খোদাওয়ান্দ প্রদত্ত বরকত অনুযায়ী যবেহ করে মাংস খেতে পারবে; কিন্তু তোমরা রক্ত কখনও খেয়ো না। (এস্তেস্না, ১২-১৫)

(৩) তোমরা দেবদেবীর নামে কোরবানীর মাংস, রক্ত, কণ্ঠরোধে নিহত জন্তু এবং হারাম কর্ম থেকে বিরত থাক। – (আহ্‌দ নামা জাদীদ কিতাব আ'মাল ১-২৯)

(৪) খ্রীষ্টানদের প্রধান পোপ পলিস ক্রিস্থিউনের নামে প্রথম পত্রে লিখেন ঃ বিধর্মীরা যেসব কোরবানী করে তা শয়তানের জন্যে করে; খোদার জন্যে নয়। আমি চাই না যে, তুমি শয়তানের অংশীদারও হও। তুমি খোদাওয়ান্দের পিয়ালা ও শয়তানের পেয়ালা উভয়টি থেকে পান করতে পার না। (ক্রিস্থিউন ১০-২০-৩০)

(৫) 'আ'মালে হাওয়ারিয়্যীন' গ্রন্থে আছে, আমি এ মীমাংসা লিখেছিলাম যে, তারা শুধু দেবদেবীর কোরবানীর মাংস থেকে এবং কণ্ঠরোধে নিহত জন্তু ও হারাম কর্ম থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখবে। (আ'মাল ২১-২৫)

এগুলো হচ্ছে আজকালকার বাইবেল সোসাইটিসমূহের মুদ্রিত

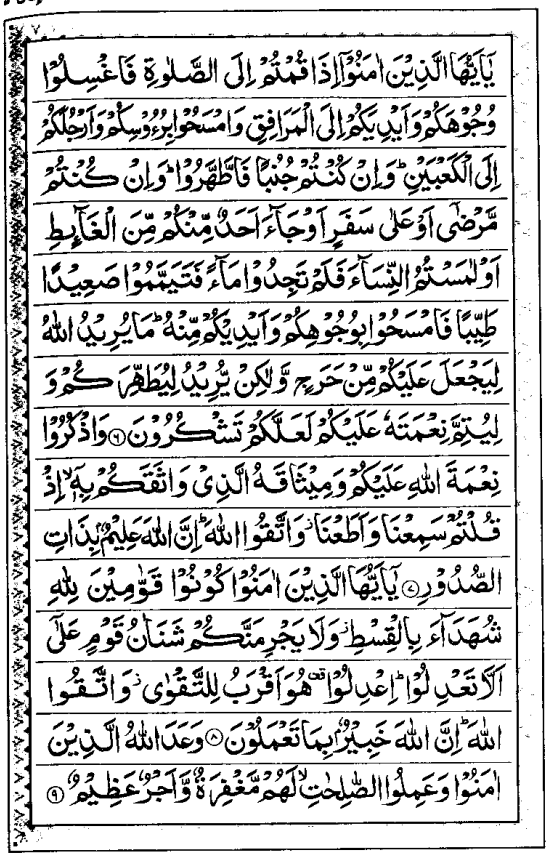

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ
إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ
لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾ وَاذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ
قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ
الصُّدُورِ ﴿٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۙ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾

*(৬) হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং পদযুগল গিটসহ। যদি তোমরা অপবিত্র হও, তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও– অর্থাৎ, স্বীয় মুখ-মণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ্ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান –যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৭) তোমরা আল্লাহ্‌র নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ অঙ্গীকারকেও যা তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে ঃ আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অন্তরের বিষয় সম্পর্কে পুরোপুরি খবর রাখেন। (৮) হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর। এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহ্‌কে ভয় কর। তোমরা যা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত। (৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।*

তওরাত ও ইঞ্জীলের উদ্ধৃতি। এতে বিস্তর পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পরও হুবহু কোরআনের বিধি-বিধানের অনুরূপ এ বিষয়বস্তুগুলো অবশিষ্ট রয়েছে।

**কোরআনের বক্তব্যও এমনি ঃ** "তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস, যে জীব আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়, কণ্ঠরোধে নিহত জন্তু,আঘাতজনিত কারণে মৃত জন্তু, উচ্চস্থান থেকে পতনে মৃত জন্তু, শিং এর আঘাতে মৃত জন্তু, হিংস্র জন্তুর ভক্ষণ করা মৃত জন্তু —তবে যদি তোমরা যবেহ করে পাক করে নিতে পার এবং ঐ জন্তু, যা দেবদেবীর যজ্ঞবেদীতে যবেহ করা হয়।"

দেখুন আহবার ৬–১৮–১৯ পর্যন্ত। এখানে হারাম মহিলাদের একটি দীর্ঘ তালিকা দেয়া হয়েছে। তাদের অধিকাংশই ঐসব মহিলা, যাদের কোরআন হারাম করেছে। এমন কি, جمع بين الاختين অর্থাৎ, দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করাও হারাম এবং হায়েয অবস্থায় সহবাস হারাম হওয়াও বর্ণিত রয়েছে। এছাড়া বাইবেলে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূর্তিপূজারী ও মুশরিকদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা অবৈধ। প্রচলিত তওরাতের ভাষা এরূপ ঃ

"তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করবে না। তাদের পুত্রদের স্বীয় কন্যা দান করবে না এবং স্বীয় পুত্রদের জন্যে তাদের কন্যা গ্রহণ করবে না। কারণ, তারা আমার অনুসরণ থেকে আমার পুত্রদের বিমুখ করে দিবে —যাতে তারা অন্য উপাস্যের উপাসনা করে। (এস্তেস্না ৭–৩–৪)

তফসীর মাযহারীতে বলা হয়েছে যে, যবেহ করার ব্যাপারে ও বিবাহের ব্যাপারে পার্থক্য এই যে, যবেহ করা জন্তু উভয় পক্ষ থেকেই হালাল। আহলে কিতাবদের যবেহ করা জন্তু মুসলমানদের জন্যে হালাল এবং মুসলমানদের যবেহ করা জন্তু আহলে-কিতাবদের জন্যে হালাল কিন্তু মহিলাদের বিবাহের ব্যাপারটি এরূপ নয়। আহলে-কিতাবদের মহিলাকে বিবাহ করা মুসলমানদের জন্যে হালাল বটে, কিন্তু আহলে-কিতাবদের সাথে মুসলমান মহিলাদের বিবাহ হালাল নয়।

আরেকটি বিষয় এই যে, যদি কোন মুসলমান কখনও ধর্মত্যাগী হয়ে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যায়, তবে সে আহলে কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না; বরং সে হবে ধর্মত্যাগী। তার যবেহ করা জন্তু সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এমনিভাবে যে মুসলমান ইসলামের কোন একটি জরুরী ও অকাট্য বিষয় অস্বীকার করার কারণে ধর্মত্যাগী বলে সাব্যস্ত হয়, সে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) —এর প্রতি বিশ্বাসের দাবী করলেও ধর্মত্যাগী এবং তার যবেহ করা জন্তু হালাল নয়। অবশ্য অন্য কোন ধর্মাবলম্বী যদি স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যায়, তবে সে আহলে-কিতাবদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তার যবেহ করা জন্তু হালাল বলে গণ্য হবে।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

৮ নং আয়াতের বিষয়বস্তু প্রায় এসব শব্দেই সূরা নেসায়ও বর্ণিত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, সেখানে كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ – বলা হয়েছিল এবং এখানে كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ – বলা হয়েছে। এ দুটি আয়াতে শব্দ আগে পিছে করার একটি সূক্ষ্ম কারণ 'বাহ্‌রে-মুহীত' কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই ঃ

স্বভাবতঃ দুটি কারণই মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারে বাধা-প্রদান এবং অন্যায় ও অবিচারে প্ররোচিত করে। (এক) নিজের অথবা বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। (দুই) কোন ব্যক্তির প্রতি শত্রুতা ও মনোমালিন্য। সূরা নেসার আয়াতে প্রথমোক্ত কারণের উপর ভিত্তি করে সুবিচারের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে শেষোক্ত কারণ হিসেবে বক্তব্য রাখা হয়েছে।

এ কারণেই সূরা-নেসার পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে - وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ -অর্থাৎ, ন্যায়বিচারে অধিষ্ঠিত থাক, যদিও তা স্বয়ং তোমাদের অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বাক্যের পর বলা হয়েছে وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا - অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেমন তোমাদেরকে ন্যায়বিচারে পশ্চাদপদ হতে উদ্বুদ্ধ না করে।

অতএব, সূরা নেসার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে নিজের এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনেরও পরওয়া কারো না। যদি ন্যায় বিচার তাদের বিরুদ্ধে যায়, তবে তাতেই কায়েম থাক। সূরা মায়েদার আয়াতের সারমর্ম এই যে, ন্যায় ও সুবিচারের ক্ষেত্রে কোন শত্রুর শত্রুতার কারণে পশ্চাদপদ হওয়া উচিত নয় যে, শত্রুর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশে সুবিচারের পরিবর্তে অবিচার শুরু করবে।

এ কারণেই সূরা নেসার আয়াতে قسط অর্থাৎ, 'ইনসাফ'কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে - كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ এবং সূরা মায়েদার আয়াতে لله - কে অগ্রে উল্লেখ করে বলা হয়েছে كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ অবশ্য উভয় আয়াত পরিণামের দিক দিয়ে একই উদ্দেশ্য প্রকাশ করে। কেননা, যে ব্যক্তি সুবিচারের জন্যে দণ্ডায়মান হবে, সে আল্লাহ্‌র জন্যেই দণ্ডায়মান হবে এবং সে সুবিচারই করবে। কিন্তু নিজের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে এরূপ ধারণা হতে পারে যে, এসব সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রাখাও তো আল্লাহ্‌র জন্যই। তাই এখানে قسط শব্দটি অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সুবিচারের বিপক্ষে কারও প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহ্‌র জন্যে হতে পারে না। সূরা মায়েদায় শত্রুদের সাথে ন্যায় বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে لله শব্দটি অগ্রে এনে মানব স্বভাবকে ভাবাবেগের কবল থেকে দূরে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌র জন্যে দণ্ডায়মান হয়েছ। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে শত্রুদের সাথেও ন্যায় বিচার কর।

মোটকথা এই যে, সূরা নেসা ও সূরা মায়েদার উভয় আয়াতে দুটি বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (এক) শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচারে অটল থাক। আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে অথবা কারও শত্রুতা পরবশ হয়ে এতে দুর্বলতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। (দুই) সত্য সাক্ষ্য এবং সত্য কথা প্রকাশ করতে পিছপা হবে না - যাতে বিচারকবর্গ সত্য ও বিশুদ্ধ রায় দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

সত্য সাক্ষ্য দিতে ত্রুটি না করার প্রতি কোরআন পাক অনেক আয়াতে বিভিন্ন ভঙ্গিতে জোর দিয়েছে। এক আয়াতে অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ অর্থাৎ, সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার অন্তর পাপী। এতে প্রমাণিত হয় যে, সত্য সাক্ষ্য দেয়া অপরিহার্য কর্তব্য এবং সাক্ষ্য গোপন করা কঠোর গোনাহ্।

কিন্তু যে বিষয়টি মানুষকে সত্য সাক্ষ্য দিতে বাধাদান করে, কোরআন পাক তার প্রতিও লক্ষ্য রেখেছে। বিষয়টি এই যে, সাক্ষীকে বার বার আদালতে হাজিরা দিতে হয় এবং অনর্থক নানা ধরনের হয়রানীরও সম্মুখীন হতে হয়। ফলে সাধারণ লোক সাক্ষীর তালিকাভুক্ত হওয়াকে সাক্ষাৎ বিপদ বলে মনে করে। নিজের কাজ কারবার তো নষ্ট হয়ই; তদুপরি অর্থহীন যাতনাও ভোগ করতে হয়।

এ কারনেই কোরআন পাক সত্য সাক্ষ্য দেয়াকে অপরিহার্য কর্তব্য সাব্যস্ত করার সাথে সাথে এ কথাও ঘোষণা করেছে যে, وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ অর্থাৎ, মোকদ্দমার বিবরণ লিপিবদ্ধকারী ও সাক্ষ্যদাতার কোন ক্ষতি করা যাবে না।

আজ-কালকার আদালত ও মোকদ্দমাসমূহের খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে, অকুস্থলের সত্য সাক্ষী খুব কমই পাওয়া যায়। সাক্ষীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার ভয়ে জ্ঞানী ও ভদ্র ব্যক্তিরা কোথাও দুর্ঘটনার আঁচ পেলে দ্রুত সেখান থেকে পলায়ন করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই বানোয়াট সাক্ষীর দ্বারা মামলা দাঁড় করানো হয়। এর ফল তাই দাঁড়াতে পারে, যা আজকাল আমরা দিবারাত্র প্রত্যক্ষ করে থাকি। শতকরা-দশ পাঁচটি মোকদ্দমারও ন্যায় ও সুবিচারভিত্তিক রায় হতে পারে না। এ ব্যাপারে আদালতকে দোষ দেয়া যায় না। কারণ, তারা প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই রায় দিতে বাধ্য।

সাধারণতঃ এ মারাত্মক ভুলটির প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। যদি সাক্ষীদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করা হতো এবং তাদেরকে বার বার পেরেশান করা না হতো, তবে কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী কোন সত্যবাদী লোক সাক্ষ্যদান থেকে বিরত থাকতো না। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে এই যে, যে পুলিশ মোকদ্দমার প্রাথমিক তদন্ত করে, সে-ই বার বার ডেকে সাক্ষীকে এমনভাবে পেরেশান করে দেয় যে, সে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে কোন মোকদ্দমার সাক্ষী না হওয়ার জন্যে ছেলেদেরকেও ওছিয়ত করে যেতে বাধ্য হয়। এরপর যদি মোকদ্দমা আদালতে পৌঁছে, তবে তারিখের পর তারিখ পড়তে থাকে। প্রতি তারিখেই নিরপরাধ সাক্ষীকে হাজিরা দেয়ার সাজা ভোগ করতে হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকাররূপে আইনের এ দীর্ঘসূত্রিতা আমাদের আদালতসমূহকে নোংরা করে রেখেছে। হেজায ও অন্যান্য কতিপয় দেশে প্রচলিত প্রাচীন সাদা-সিধা বিচার পদ্ধতিতে একদিকে যেমন মোকদ্দমার প্রাচুর্য নাই, অন্যদিকে তেমনি সাক্ষীদের পক্ষে সাক্ষদানও কষ্টকর নয়।

মোটকথা এই যে, সাক্ষ্যদান পদ্ধতি ও বিচার পদ্ধতিকে কোরআনী শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে তোলা হলে এর বরকত আজও দেখা যেতে পারে। কোরআন একদিকে ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞাত লোকদের উপর সত্য সাক্ষ্যদান অপরিহার্য সাব্যস্ত করেছে এবং অপরদিকে সাক্ষীদেরকে অকারণে উত্যক্ত না করতে এবং যথাসম্ভব কম সময়ে বয়ান নিয়ে ছেড়ে দিতে নির্দেশ জারি করেছে।

**পরীক্ষার নম্বর, সনদ-সার্টিফিকেট ও নির্বাচনের ভোট দান সবই সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ঃ** পরিশেষে এখানে আরও একটি বিষয় জানা জরুরী। তা এই যে, আজকাল শাহাদত তথা সাক্ষ্যদানের যে অর্থ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তা শুধু মামলা-মোকদ্দমায় কোন বিচারকের সামনে সাক্ষ্য দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোরআন ও সুন্নাহ

পরিভাষায় 'শাহাদত' শব্দটি আরও ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণতঃ যদি ডাক্তার কোন রোগীকে সার্টিফিকেট দেয় যে, সে কর্তব্য পালনের যোগ্য নয় কিংবা চাকুরী করার যোগ্য নয়, তবে এটিও একটি শাহাদত। এতে বাস্তব অবস্থার খেলাফ যদি কিছু লেখা হয়, তবে তা মিথ্যা সাক্ষ্য হয়ে কবিরা গোনাহ্ হবে।

এমনিভাবে পরীক্ষার্থীদের লিখিত খাতায় নম্বর দেয়াও একটি শাহাদত। যদি ইচ্ছাপূর্বক কিংবা শৈথিল্যভরে কম বা বেশী নম্বর দেয়া হয়, তবে তাও মিথ্যা সাক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত হারাম ও কঠোর পাপ বলে গণ্য হবে।

উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে সনদ ও সার্টিফিকেট বিতরণের অর্থ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়া যে, তারা সংশ্লিষ্ট কাজের পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছে। যদি সনদধারী ব্যক্তি বাস্তবে এরূপ না হয়, তবে সার্টিফিকেট ও সনদে স্বাক্ষরদাতা সবাই মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধে অপরাধী হয়ে যাবে।

এমনিভাবে আইন সভা, কাউন্সিল ইত্যাদির নির্বাচনে ভোট দেয়াও এক প্রকার সাক্ষ্যদান। এতে ভোটদাতার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দেয়া হয় যে, আমার মতে এ ব্যক্তি ব্যক্তিগত যোগ্যতা, সততা ও বিশ্বস্ততার দিক দিয়ে জাতির প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্য।

এখন চিন্তা করুন, আমাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়জন এমন আছেন, যাদের বেলায় এ সাক্ষ্য সত্য ও বিশুদ্ধ হতে পারে? দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের জনগণ নির্বাচনকে একটি হার-জিতের খেলা মনে করে রেখেছে। এ কারণে কখনও পয়সার বিনিময়ে ভোটাধিকার বিক্রয় করা হয়, আবার কখনও চাপের মুখে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা হয়। আবার কখনও সাময়িক বন্ধুত্ব এবং সস্তা অঙ্গীকারের ভরসায় একে ব্যবহার করা হয়।

অন্যের কথা কি বলব, লেখাপড়া জানা ধার্মিক মুসলমানও আযোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিতে গিয়ে কখনও চিন্তা করেন না যে, সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে খোদায়ী অভিশাপ ও শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

কোরআনের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে ভোট দেয়ার দ্বিতীয় একটি দিক রয়েছে —যাকে শাফায়াত বা সুপারিশ বলা হয়। ভোটদাতা ব্যক্তি যেন সুপারিশ করে যে, অমুক প্রার্থীকে প্রতিনিধিত্ব দান করা হোক। কোরআনের ভাষায় এ সম্পর্কিত নির্দেশ পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছেঃ

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি উত্তম ও সত্য সুপারিশ করবে, যার জন্যে সুপারিশ করে, তাকে তার পুণ্য থেকে অংশ দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ ও মিথ্যা সুপারিশ করবে, সে তার মন্দ কর্মের অংশ পাবে।

এর ফলশ্রুতি এই যে, এ প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে তার কর্মজীবনে যেসব ভ্রান্ত ও অবৈধ কাজ করবে, তার পাপ ভোটদাতাও বহন করবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে ভোটের তৃতীয় দিক হচ্ছে ওকালতির দিক। অর্থাৎ, ভোটদাতা প্রার্থীকে নিজ প্রতিনিধিত্বের জন্যে উকিল নিযুক্ত করে। কিন্তু এ ওকালতি যদি ভোট দাতার ব্যক্তিগত অধিকার সম্পর্কে হতো এবং এর লাভ-লোকসান কেবল মাত্র সে-ই পেত, তবে এর জন্যে সে নিজেই দায়ী হতো, কিন্তু এখানে ব্যাপারটি তেমন নয়। কেননা, এ ওকালতি এমনসব অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত যাতে তার সাথে সমগ্র জাতিও শরীক। কাজেই কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে স্বীয় প্রতিনিধিত্বের জন্যে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে গোটা জাতির অধিকার খর্ব করার পাপও ভোটদাতার কাঁধে চেপে বসবে।

মোটকথা, আমাদের ভোটের তিনটি দিক রয়েছে। (এক) সাক্ষ্যদান, (দুই) সুপারিশ করা এবং (তিন) সম্মিলিত অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করা। এ তিনটি ক্ষেত্রে সৎ, ধর্মভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দান করা যেমন বিরাট ছোয়াবের কাজ এবং এর সুফল যেমন ভোটদাতাও প্রাপ্ত হয়, তেমনি আযোগ্য ও অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে ভোট দেয়া, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, মন্দ সুপারিশ এবং অবৈধ ওকালতির অন্তর্ভুক্ত এবং এর মারাত্মক ফলাফলও ভোটদাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে।

তাই ভোটদানের পূর্বে প্রার্থী সংশ্লিষ্ট কাজের যোগ্যতা রাখে কিনা এবং সে সৎ ও ধর্মভীরু কিনা, তা যাচাই করে দেখা প্রত্যেকটি মুসলমান ভোটারের অবশ্য কর্তব্য। শৈথিল্য ও ঔদাসীন্যবশতঃ অকারণে বিরাট পাপের ভাগী হওয়া উচিত নয়।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ ⑩ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ
فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ⑪ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ
لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم
بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ⑫ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ
لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ
عَن مَّوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ
تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ⑬

*(১০) যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলে, তারা দোযখী। (১১) হে মুমিনগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন এক সম্প্রদায় তোমাদের দিকে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল, তখন তিনি তাদের হস্ত তোমাদের থেকে প্রতিহত করে দিলেন। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং মুমিনদের আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত। (১২) আল্লাহ্ বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ্ বলে দিলেন ঃ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্লাহ্‌কে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ্ দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিনীসমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফের হয়, সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। (১৩) অতএব, তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের দরুন আমি তাদের উপর অভিসম্পাত করেছি এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিয়েছি। তারা কালামকে তার স্থান থেকে বিচ্যুত করে দেয় এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা তা থেকে উপকার লাভ করার বিষয়টি বিস্মৃত হয়েছে। আপনি সর্বদা তাদের কোন না কোন প্রতারণা সম্পর্কে অবগত হতে থাকেন, তাদের অল্প কয়েকজন ছাড়া। অতএব, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মার্জনা করুন। আল্লাহ্ অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।*

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা মায়েদার পূর্বোল্লেখিত সপ্তম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের কাছ থেকে একটি অঙ্গীকার নেয়ার এবং তাদের তা মেনে নেয়ার কথা উল্লেখ করেছিলেন ঃ

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ
إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ

এ অঙ্গীকারটি হচ্ছে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য ও শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার। এর পারিভাষিক শিরোনাম কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্" উচ্চারণকারী প্রতিটি মুসলমান এ অঙ্গীকারের অধীন। এর পরবর্তী আয়াতে অঙ্গীকারের কয়েকটি প্রধান দফা অর্থাৎ, শরীয়তের বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। তাতে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার জন্যে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং ক্ষমতারোহণের পর শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধের পরিবর্তে সুবিচার ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহ্ তা'আলার একটি বড় নেয়ামত। এ কারণেই اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ বলে তার বর্ণনা শুরু করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতটিকেও আবার اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ বাক্য দ্বারা শুরু করে বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা উপরোক্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে শক্তি, উন্নতি ও উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে শত্রুদের কলা কৌশলকে সফল হতে দেননি।

এ আয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শত্রুরা বার বার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও মুসলমানদেরকে হত্যা, লুণ্ঠন ও ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার যেসব পরিকল্পনা করে, সেগুলো আল্লাহ্ ব্যর্থ করে দেন। বলা হয়েছে ঃ একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার চিন্তায় লিপ্ত ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদের হস্তকে প্রতিহত করে দিয়েছেন। ইসলামের ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে কাফেরদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। কিন্তু তফসীরবিদগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কিছু সংখ্যক বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও উল্লেখ করেছেন। উদাহরণতঃ মুসনাদে-আবদুর রাজ্জাকে হযরত জাবের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে ঃ

কোন এক জেহাদে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম এক জায়গায় অবস্থান করছিলেন। বিস্তৃত ময়দানের বিভিন্ন অংশে সাহাবীগণ বিশ্রাম গ্রহণ করতে লাগলেন। এদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একটি গাছের ডালে তরবারি ঝুলিয়ে তার নীচে শুয়ে পড়লেন। শত্রুদের মধ্য থেকে জনৈক বেদুঈন সুযোগ বুঝে তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে প্রথমেই তরবারিটি হস্তগত করে ফেলল। অতঃপর তাঁর দিকে তরবারী উঁচিয়ে বলল ঃ আমার কবল থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে?

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) চকিতে উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা। আগন্তুক আবার তার বাক্য পুনরাবৃত্তি করল। তিনিও নিশ্চিন্তে বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা। কয়েকবার এরূপ কথাবার্তা হওয়ার পর অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে আগন্তুক তরবারী কোষবদ্ধ করতে বাধ্য হল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সাহাবীগণকে ডেকে ঘটনা শুনালেন। আগন্তুক বেদুঈন তখনও তাঁর

পাশেই উপবিষ্ট ছিল। তিনি তাকে কিছুই বললেন না। - (ইবনে-কাসীর)

কোন কোন সাহাবী থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফ একবার রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে স্বগৃহে দাওয়াত করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রসূলকে যথাসময়ে এ সংবাদ দিয়ে শত্রুর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেন। - (ইবনে কাসীর)

হযরত মুজাহিদ, ইকরিমা (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার এক মোকদ্দমার ব্যাপারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বনী-নুযায়রের ইহুদীদের বস্তিতে গমন করেন। তারা তাঁকে একটি প্রাচীরের নীচে বসতে দিয়ে কথাবর্তায় ব্যাপৃত রাখে। অপর দিকে আমর ইবনে জাহ্শ নামক এক দুরাত্মাকে নিয়োগ করা হয় প্রাচীরের পিছন দিক থেকে উপরে উঠে একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড তাঁর উপর গড়িয়ে দেয়ার জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরকে তাদের সংকল্পের কথা জানিয়ে দেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে প্রস্থান করেন। - (ইবনে-কাসীর)

এসব ঘটনায় কোন বৈপরীত্য নাই —সবগুলোই আলোচ্য আয়াতের সাক্ষী হতে পারে। আয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদের অদৃশ্য হেফাযতের কথা উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ এতে প্রথমতঃ বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র নেয়ামত লাভ করা একমাত্র রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এ সাহায্য ও অদৃশ্য হেফাযতের আসল কারণ হচ্ছে তাকওয়া তথা আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা। যে কোন জাতি অথবা ব্যক্তি যে কোন সময় যে কোন স্থানে এ দু'টি গুণ অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তারই এভাবে হেফাযত ও সংরক্ষণ করা হবে।

আলোচ্য বাক্যটিতে পূর্ববর্তী আয়াত সমষ্টির সাথেও সংযুক্ত করা যায়, যাতে চরম শত্রুদের সাথেও সদ্ব্যবহার ও সুবিচার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন এদিকে ইঙ্গিত হবে যে, এহেন ঘোর শত্রুদের সাথে সদ্ব্যবহার ও উদারতার শিক্ষা বাহ্যতঃ একটি রাজনৈতিক ভ্রান্তি এবং শত্রুদেরকে দুঃসাহসী করে তোলার নামান্তর। তাই এ বাক্যে মুসলমানদেরকে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যদি খোদাভীরু ও আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী হও, তবে এ উদারতা ও সদ্ব্যবহার তোমাদের জন্যে মোটেই ক্ষতিকর হবে না, বরং তা শত্রুদেরকে বিরুদ্ধাচরণে দুঃসাহসী করার পরিবর্তে তোমাদের প্রভাবাধীন ও ইসলামের নিকটবর্তী করার কারণ হবে। এছাড়া খোদাভীতিই মানুষকে অঙ্গীকার মেনে চলতে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিক থেকে বাধ্য করতে পারে। যেখানে খোদাভীতি নাই, সেখানে অঙ্গীকারের দশা তাই হয়, যা আজকাল সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায়। এ কারণে পূর্ববর্তী যে আয়াতে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছিল, সেখানে আয়াতের শেষাংশে وَاتَّقُوا اللّٰهَ (আল্লাহ্কে ভয় কর) বলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতে এ বাক্যটি আবার উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া সম্পূর্ণ আয়াতে এদিকেও ইশারা করা হয়েছে যে, মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য শুধু বাহ্যিক সমরোপকরণের উপর মোটেও নির্ভরশীল নয়, বরং তাদের আসল শক্তি তাকওয়া ও আল্লাহ্র মধ্যেই নিহিত।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী-ইসরাঈল দুর্ভাগ্যবশতঃ এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রতি কর্ণপাত করেনি এবং অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্ন আযাবে নিক্ষেপ করেন।

বনী-ইসরাঈলের প্রতি কুকর্ম ও অবাধ্যতার ফলে দুই প্রকার আযাব নেমে আসে। (এক) বাহ্যিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আযাব। যেমন রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদির বৃষ্টি বর্ষণ, প্রস্তর বর্ষণ, ভূমি উলটিয়ে দেয়া ইত্যাদি। এগুলো কোরআন পাকের অনেক আয়াতে বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

(দুই) আত্মিক আযাব। অর্থাৎ, অবাধ্যতার ফলে তাদের অন্তর ও মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। তাতে চিন্তা-ভাবনা ও বুঝার ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। ফলে তারা পাপের পরিণামে আরও পাপে লিপ্ত হতে থাকে।

এরশাদ হচ্ছে "আমি বিশ্বাসঘাতকতা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাজা হিসেবে তাদেরকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলাম এবং তাদের অন্তরকে কঠোর করে দিলাম।" ফলে এখন এতে কোন কিছুর সংকুলান রইল না। রহমত থেকে দূরে পড়া এবং অন্তরের কঠোরতাকেই সূরা মুতাফ্ফিফীনে 'মরিচা' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে — "কোরআনী আয়াত ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার কারণ এই যে, তাদের অন্তরে পাপের কারণে 'মরিচা' পড়ে গেছে।"

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এক হাদীসে বলেন ঃ

মানুষ প্রথমে যখন কোন পাপ কাজ করে, তখন তার অন্তরে একটি কাল দাগ পড়ে। এর অনিষ্ট সর্বদাই সে অনুভব করে, যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়ে কাল দাগ লেগে গেলে তা দৃষ্টিকে সব সময়ই কষ্ট দেয়। এরপর যদি সে সতর্ক হয়ে তওবা করে এবং ভবিষ্যতে পাপ না করে, তবে এ দাগ মিটিয়ে দেয়া হয়। পক্ষান্তরে যদি সে সতর্ক না হয় এবং উপর্যুপরি পাপ কাজ করেই চলে, তবে প্রত্যেক গোনাহ্র কারণে একটি করে কাল দাগ বেড়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তার অন্তর কাল দাগে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। তখন তার অন্তরের অবস্থা ঐ পাত্রের মত হয়ে যায়, যা উপুড় করে রাখা হয় এবং কোন জিনিস রাখলে তৎক্ষণাৎ বের হয়ে আসে। - পরে পাত্রে কিছু থাকে না। ফলে কোন সৎ ও পুণ্যের বিষয় তার অন্তরে স্থান পায় না। তখন তার অন্তর لايعرف معروفا ولاينكر منكرا কোন পুণ্য কাজকে পুণ্য এবং মন্দ কাজকে মন্দ মনে করে না। বরং ব্যাপার উল্টো হয়ে যায়। অর্থাৎ, দোষকে গুণ, পুণ্যকে পাপ এবং পাপকে ছোয়াব মনে করতে থাকে এবং অবাধ্যতায় বেড়েই চলে। এটা হচ্ছে তার পাপের নগদ সাজা- যা সে ইহকালেই লাভ করে।

বনী-ইরাঈলরা অঙ্গীকার ভঙ্গের নগদ সাজা এই লাভ করে যে, মুক্তির সর্ববৃহৎ উপায় আল্লাহ্র রহমত থেকে তারা দূরে পড়ে যায় এবং অন্তর এমন পাষাণ হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র কালামকে তারা স্বস্থান থেকে ঘুরিয়ে দেয় অর্থাৎ, আল্লাহ্র কালামে পরিবর্তন করে। কখনও শব্দে, কখনও অর্থে এবং কখনও তেলাওয়াতে পরিবর্তন করে। পরিবর্তনের এ প্রকারগুলো কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আজকাল পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টানও একথা কিছু কিছু স্বীকার করে। - (তফসীরে ওসমানী)

**খ্রীষ্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ঃ** এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা খ্রীষ্টানদের অঙ্গীকার ভঙ্গের সাজা বর্ণনা করে বলেছেন যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিভেদ, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সঞ্চারিত করে দেয়া হয়েছে —যা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

আজকালকার খ্রীষ্টানদেরকে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ দেখে আয়াতের সত্যতায় সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। উত্তর এই যে, আয়াতে প্রকৃত খ্রীষ্টানদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। যারা ধর্মকর্ম ত্যাগ করে নাস্তিক হয়ে গেছে, তারা প্রকৃত পক্ষে খৃস্টানদের তালিকাভুক্ত নয় - যদিও জাতিগতভাবে তারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান নামেই অভিহিত করে। এমন

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰٓى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ
فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ ۠ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ وَسَوْفَ
يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١٤﴾ يٰٓاَهْلَ
الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا
مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَعْفُوْا عَنْ
كَثِيْرٍ ؕ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ
مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ
سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ
بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾ لَقَدْ
كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ؕ
قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ
الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ؕ
وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ يَخْلُقُ
مَا يَشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٧﴾

*(১৪) যারা বলে : আমরা নাছারা, আমি তাদের কাছ থেকেও তাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম। অতঃপর তারাও যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা থেকে উপকার লাভ করা ভুলে গেল। অতঃপর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন। (১৫) হে আহ্‌লে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রাসূল আগমন করেছেন। কিতাবের যেসব বিষয় তোমরা গোপন করতে, তিনি তার মধ্য থেকে অনেক বিষয় প্রকাশ করেন এবং অনেক বিষয় মার্জনা করেন। তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। (১৬) এর দ্বারা আল্লাহ্ যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন। (১৭) নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে, মসীহ্ ইবনে মরিয়মই আল্লাহ্। আপনি জিজ্ঞেস করুন, যদি তাই হয়, তবে বল— যদি আল্লাহ্ মসীহ্ ইবনে মরিয়ম, তাঁর জননী এবং ভূমণ্ডলে যারা আছে, তাদের সবাইকে ধ্বংস করতে চান, তবে এমন কারও সাধ্য আছে কি যে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাদেরকে বিন্দুমাত্রও বাঁচাতে পারে? নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা আছে, সবকিছুর উপর আল্লাহ্ তা'আলারই আধিপত্য। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর শক্তিমান।*

খ্রীষ্টানদের মধ্যে যদি ধর্মীয় বিদ্বেষ ও পারস্পরিক শত্রুতা না থাকে, তবে তা আলোচ্য আয়াতের পরিপন্থী নয়। কেননা, ধর্মের ভিত্তিতেই বিভেদ ও বিদ্বেষ হতে পারত। যখন তাদের ধর্মই নাই, তখন বিভেদ কিসের। যারা ধর্মগত দিক দিয়ে খ্রীষ্টান, আয়াতে তাদের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে। এরূপ খ্রীষ্টানদের মতভেদ সর্বজনবিদিত।

বায়যাভীর টীকায় তাইসীর গ্রন্থ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আসলে তিনটি সম্প্রদায় রয়েছে। (এক) নিস্তরিয়া। এরা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে। (দুই) ইয়াকূবিয়া। এরা ইসাকে খোদার সাথে এক মনে করে। (তিন) মালকাইয়া। এরা ঈসা (আঃ)-কে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

যেখানে মৌলিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এত বড় মতানৈক্য, সেখানে পারস্পরিক শত্রুতা অপরিহার্য।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে খ্রীষ্টানদের একটি উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে— যা তাদের একদলের ধর্ম বিশ্বাসও ছিল। অর্থাৎ, হযরত মসীহ (আঃ) (মা'আযাল্লাহ) হুবহু আল্লাহ্ তাআলা। কিন্তু যে যুক্তি দ্বারা বিষয়টির খণ্ডন করা হয়েছে, তাতে খ্রীষ্টানদের সব দলের একত্ববাদ বিরোধী ভ্রান্ত বিশ্বাসেরই খণ্ডন হয়ে যায়, তা মসীহ (আঃ)-এর খোদার সন্তান হওয়া সংক্রান্ত বিশ্বাসই হোক অথবা তিন খোদার অন্যতম খোদা হওয়ার বিশ্বাসই হোক।

এস্থলে হযরত মসীহ ও তাঁর জননীকে উল্লেখ করার মধ্যে দু'টি রহস্য থাকতে পারে। (এক) আল্লাহ্ তাআলার সামনে মসীহ (আঃ)-এর এ অক্ষমতা যে, তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন না এবং যে জননীর খেদমত ও হেফাযত তাঁর কাছে প্রাণের চেয়েও প্রিয়, সে জননীকেও রক্ষা করতে পারেন না। (দুই) এতে ঐ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসও খণ্ডন করা হয়েছে, যারা মরিয়মকে তিন খোদার অন্যতম খোদা বলে বিশ্বাস করে।

এস্থলে হযরত মসীহ ও মরিয়মের মৃত্যুকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কোরআন অবতরণের সময় হযরত মরিয়মের মৃত্যু ধরে নেয়ার পর্যায়ে ছিল না; বরং বাস্তবেই মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। এর এক কারণ تغليب অর্থাৎ, আসলে হযরত মসীহ (আঃ)-এর মৃত্যুকে ধরে নেয়ার পর্যায়ে বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল। অতঃপর জননীর মৃত্যুকেও একই ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে—যদিও তাঁর মৃত্যু আগেই হয়ে গিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে একথাও বলা যায় যে, আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, আমি মরিয়মকে যেমন মৃত্যুদান করেছি, তেমনি হযরত মসীহ্ ও অন্যান্য সৃষ্টজীবের মৃত্যুও আমারই হাতে। يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ বাক্যে খ্রীষ্টানদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণকেও খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা, হযরত মসীহ্‌কে খোদা মনে করার আসল কারণ তাদের মতে এই ছিল যে, তিনি জগতের সাধারণ নিয়মের বিপরীতে পিতা ছাড়া শুধুমাত্র গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মানুষ হলে নিয়মানুযায়ী পিতা-মাতা উভয়ের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করতেন।

আলোচ্য বাক্যে এর উত্তর দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা যাকে ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। যেমন, مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ আয়াতে এ সন্দেহই নিরসন করা হয়েছে। অর্থাৎ খোদার সাধারণ নিয়মের বাইরে মসীহ্ (আঃ)-কে সৃষ্টি করা তার খোদা হওয়ার প্রমাণ হতে পারে না।

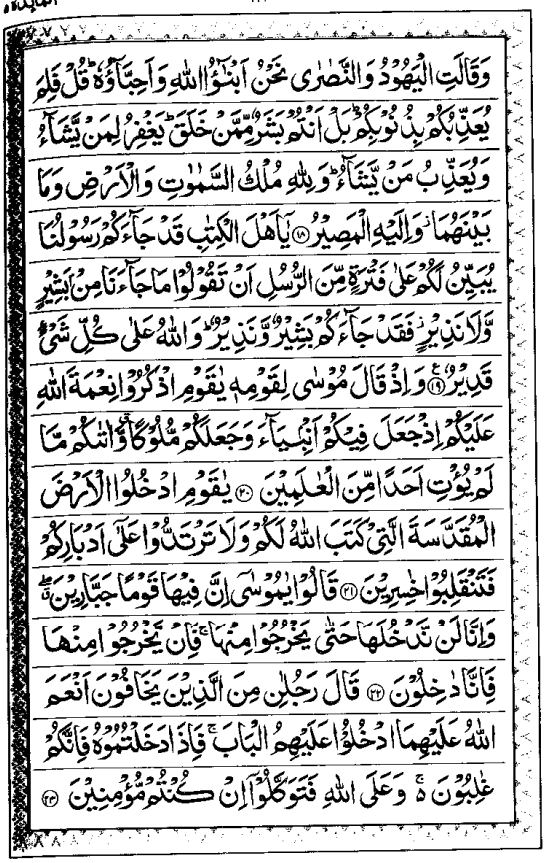

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ قُلْ فَلِمَ
يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ
وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ
وَّلَا نَذِيْرٍ ۫ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ ﴿١٩﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ
عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۚ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا
لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٠﴾ يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ
الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِكُمْ
فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖ
وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا
فَاِنَّا دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ
اللّٰهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ
غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٣﴾

*(১৮) ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি দান করবেন? বরং তোমারও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করেন। নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তাতে আল্লাহ্‌রই আধিপত্য রয়েছে এবং তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (১৯) হে আহলে-কিতাবগণ! তোমাদের কাছে আমার রসূল আগমণ করেছেন, যিনি পয়গম্বরদের বিরতির পর তোমাদের কাছে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা একথা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শক আগমন করেননি। অতএব, তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক এসে গেছেন। আল্লাহ্‌ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (২০) যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামত স্মরণ কর,যখন তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করেছেন, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন জিনিস দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের কাউকে দেননি। (২১) হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। (২২) তারা বলল ঃ হে মূসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব। (২৩) খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দুব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছিলেন ঃ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহ্‌র উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।*

লক্ষ্যণীয় যে, হযরত আদমকে আল্লাহ্‌ তাআলা পিতা ও মাতা উভয়ের মাধ্যম ছাড়াই সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সবকিছুই করতে পারেন। তিনিই স্রষ্টা, প্রভু ও উপাসনার যোগ্য। অন্য কেউ তাঁর অংশীদার নয়।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ – فترت এর শাব্দিক অর্থ মন্থর হওয়া, অনড় হওয়া, এবং কোন কাজকে বন্ধ করে দেয়া। আলোচ্য আয়াতে তফসীরবিদগণ فترت এর শেষোক্ত অর্থই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, পয়গম্বরগণের আগমন-পরম্পরা কিছুদিনের জন্যে বন্ধ থাকা। হযরত ঈসার পর শেষনবী (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের সময় পর্যন্ত যে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে, তাই فترت এর যমানা।

**فترت এর যমানা কতটুকু ঃ** হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাঝখানে এক হাজার সাতশ, বছরের ব্যবধান ছিল। এ সময়ের মধ্যে পয়গম্বরগণের আগমন একাদিক্রমে অব্যাহত ছিল। এতে কখনও বিরতি ঘটেনি। শুধু বনী-ইসরাঈলের মধ্য থেকেই এক হাজার পয়গম্বর এ সময়ে প্রেরিত হয়েছিলেন। বনী-ইসরাঈল ছাড়া অন্য গোত্র থেকেও অনেক পয়গম্বর আগমন করেছিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর জন্ম ও রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের মাঝখানে মাত্র পাঁচ'শ বছরকাল পয়গম্বরগণের আগমন বন্ধ ছিল। এ সময়টিকেই فترت তথা বিরতির সময় বলা হয়। এর আগে কখনও এত দীর্ঘ সময় পয়গম্বরগণের আগমন বন্ধ ছিল না।—(কুরতুবী)

হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল এবং হযরত ঈসা ও শেষ নবী মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাঝখানে কতটুকু সময় ছিল, সে সম্পর্কে আরও বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে, যাতে সময়ের পরিমাণ কম-বেশী বর্ণনা করা হয়েছে ; কিন্তু এতে আসল উদ্দেশে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না।

ইমাম বোখারী হযরত সালমান ফারসীর রেওয়ায়েত ক্রমে বর্ণনা করেন ঃ হযরত ঈসা ও শেষনবী (সাঃ)-এর মাঝখানে সময় ছিল ছয়শ' বছর। এ সময়ের মধ্যে কোন পয়গাম্বর প্রেরিত হননি। বোখারী ও মুসলিমের বরাত দিয়ে মেশকাতে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেন, انا اولى الناس بعيسى অর্থাৎ, আমি ঈসা (আঃ)-এর সবচাইতে নিকটবর্তী। এর মর্ম হাদীসের শেষাংশে বলা হয়েছে ليس بيننا نبى অর্থাৎ, আমাদের মাঝখানে কোন পয়গম্বর প্রেরিত হননি।

সূরা ইয়াসীনে যে তিন জন 'রসূলের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক প্রেরিত দূত ছিলেন। আভিধানিক অর্থেই তাদেরকে 'রসূল' বলা হয়েছে।

বিরতির সময়ে খালেদ ইবনে সিনান নবী ছিলেন বলে কেউ কেউ বর্ণনা করেন। এ সম্পর্কে তফসীরে রূহুল মা'আনীতে শিহাবের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি নবী ছিলেন ঠিক; কিন্তু তাঁর নবুওয়তকাল ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের পূর্বে—পরে নয়।

**অন্তবর্তীকালের বিধান ঃ** আলোচ্য আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, যদি কোন সম্প্রদায়ের কাছে কোন রসূল, পয়গম্বর অথবা তাদের কোন প্রতিনিধি আগমন না করে এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তও তাদের কাছে সংরক্ষিত না থাকে, তবে তারা শেরক ছাড়া অন্য কোন

কুকর্ম ও গোমরাহীতে লিপ্ত হলে তা ক্ষমার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তারা আযাবের যোগ্য হবে না। এ কারণেই অর্ন্তবর্তীকালের লোকদের সম্পর্কে ফেকাহ্‌বিদগণের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে যে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে কি না।

সাধারণ ফেকাহ্‌বিদগণ বলেন ঃ তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে বলেই আশা করা যায়, যদি তারা নিজেদের ঐ ধর্ম অনুসরণ করে, যা ভুলভ্রান্ত অবস্থায় হযরত ঈসা অথবা মূসা (আঃ)-এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে তাদের কাছে এসেছিল। তারা একত্ববাদের বিরুদ্ধাচরণ ও শেরকে লিপ্ত হলে একথা প্রযোজ্য হবে না। কেননা, একত্ববাদ কোন পয়গম্বরের পথ প্রদর্শনের অপেক্ষা রাখে না। সামান্য চিন্তা-ভাবনা করে নিজস্ব জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারাই মানুষ তা জেনে নিতে পারে।

**একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ** এখানে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, আলোচ্য আয়াতে যেসব ইহুদী ও খ্রীষ্টানকে সম্বোধন করা হয়েছে, অর্ন্তবর্তীকালে তাদের কাছে কোন রসূল আগমন না করলেও তৌরাত ও ইঞ্জীল তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তাদের আলেম সম্প্রদায়ও ছিল। এমতাবস্থায় ''আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক পৌছে নি'' বলে তাদের ওজর পেশ করার কোন যুক্তি ছিল কি? উত্তর এই যে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর আমল পর্যন্ত তৌরাত ও ইঞ্জীল অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল না। বিভিন্ন পরিবর্তনের ফলে তাতে মিথ্যা ও বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনী অনুপ্রবেশ করেছিল। কাজেই তা থাকা না থাকা সমান ছিল। ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ আলেমের বর্ণনা অনুযায়ী তৌরাতের আসল লিপি কারও কাছে কোন অজ্ঞাত স্থানে বিদ্যমান থাকলেও তা এর পরিপন্থী নয়।

**শেষ নবীর বিশেষ মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত ঃ** ''আমার রসূল মুহাম্মদ (সাঃ) দীর্ঘ বিরতির পর আগমন করেছেন'— আলোচ্য আয়াতে আহলে-কিতাবদের সম্বোধন করে একথা বলার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তোমাদের উচিত তাঁর আগমনকে খোদাপ্রদত্ত বিরাট দান ও বড় নেয়ামত মনে করা। কেননা, পয়গম্বরের আগমন সুদীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। এখন তোমাদের জন্যে তা আবার খোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় ইঙ্গিত এদিকেও রয়েছে যে,তাঁর আগমন এমন এক যুগে ও এমন স্থানে হয়েছে, যেখানে জ্ঞান ও ধর্মের কোন আলো ছিল না। খোদার সৃষ্ট মানব খোদার সাথে পরিচয় হারিয়ে মূর্তিপূজায় মনোনিবেশ করেছিল। এমন জাহেলিয়াতের যুগে এহেন পথভ্রান্ত জাতির সংশোধন করা সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু তাঁর সংসর্গের কল্যাণ ও নবুওয়তের জ্যোতির পরশে অল্প দিনের মধ্যেই এ জাতি সমগ্র বিশ্বের জন্যে জ্ঞান-গরিমা, কর্মপ্রেরণা, সচ্চরিত্রতা, লেন-দেন, সামাজিকতা ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য হয়ে পড়ে। এতে করে রসূলুল্লাহ্ এর নবুওয়ত ও তাঁর পয়গম্বরসুলভ শিক্ষা যে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের চাইতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট, তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যে ডাক্তার কোন চিকিৎসা থেকে নিরাশ রোগীর চিকিৎসা এমন জায়গায় করে, যেখানে ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্রও দুর্লভ, অতঃপর তাঁর সফল চিকিৎসায় মরণোম্মুখ রোগী শুধু আরোগ্যই লাভ করে না; বরং একজন বিচক্ষণ ও পারদর্শী চিকিৎসকও হয়ে যায়, এমন ডাক্তারের উৎকৃষ্টতায় কারও মনে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

সুদীর্ঘ বিরতির পর যখন চারদিকে অন্ধকারই অন্ধকার বিরাজ করছিল, তখন তাঁর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চতুর্দিককে এমন আলোকোদ্ভাসিত করে তুলে যে, অতীত যুগে এর দৃষ্টান্ত কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব, সব মো'জেযা একদিকে রেখে একা এ মো'জেযাটিই মানুষকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতে পারে।

পূর্ববর্তী এক আয়াতে সে অঙ্গীকারের কথা বলা হয়েছে যা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের আনুগত্যের ব্যাপারে বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে নেয়া হয়েছিল। এর সাথে সাথে তাদের সাধারণ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকরণ, অঙ্গীকারের বিরুদ্ধাচরণ এবং তার শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের একটি বিশেষ ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে।

ঘটনাটি এই যে, ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত হল এবং মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায় বনী-ইসরাঈল ফেরাউনের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মিসরের আধিপত্য লাভ করল, তখন আল্লাহ্ তাআলা সেই সঙ্গে তাদেরকে আরো কিছু নেয়ামত এবং তাদের পৈতৃক দেশ সিরিয়াকেও তাদের অধিকারে প্রত্যার্পণ করতে চাইলেন। সেমতে মূসা আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তাদেরকে জেহাদের উদ্দেশে পবিত্র ভূমি সিরিয়ায় প্রবেশ করতে নির্দেশ দেয়া হল। সাথে সাথে তাদেরকে আগাম সুসংবাদও দেয়া হল যে, এ জেহাদে তারাই বিজয়ী হবে। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা এ পবিত্র ভূমির আধিপত্য তাদের ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন যা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু বনী-ইসরাঈল প্রকৃতিগত হীনতার কারণে আল্লাহ্‌র বহু নেয়ামত তথা ফেরাউনের সাগরডুবি ও তাদের মিসর অধিকার ইত্যাদি স্বচক্ষে দেখেও এক্ষেত্রে অঙ্গীকার পালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে সক্ষম হল না। তারা সিরিয়ার জেহাদ সম্পর্কিত আল্লাহ্ তাআলার এ নির্দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় জেদ ধরে বসে রইল। ফলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর কঠোর শাস্তি নাযিল করলেন। পরিণতিতে তারা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত একটি সীমাবদ্ধ এলাকায় অবরুদ্ধ ও বন্দী হয়ে রইল। বাহ্যতঃ তাদের চারপাশে কোন বাধার প্রাচীর ছিল না এবং তাদের হাত, পা ও শেকল বাঁধা ছিল না; বরং তারা ছিল উন্মুক্ত প্রান্তরে। তারা স্বদেশে অর্থাৎ, মিসর ফিরে যাবার জন্যে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথও চলত; কিন্তু তারা নিজেদেরকে সেখানেই দেখতে পেত, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিল। ইত্যবসরে হযরত মূসা ও হারূন (আঃ)-এর ওফাত হয়ে যায় এবং বনী-ইসরাঈল তীহ্ প্রান্তরেই উদভ্রান্তের মত ঘুরাফেরা করতে থাকে। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তাদের হেদায়েতের জন্য অন্য একজন পয়গম্বর প্রেরণ করলেন।

এমনিভাবে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পর বনী-ইসরাঈলের অবশিষ্ট বংশধর তৎকালীন পয়গম্বরের নেতৃত্বে সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাসের জন্যে জেহাদের সংকল্প গ্রহণ করে এবং আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা ও পূর্ণতা লাভ করে। এ হচ্ছে আয়াতে বর্ণিত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবার কোরআনের ভাষায় বিস্তারিত ঘটনা শুনুন ঃ

হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বায়তুল মুকাদ্দাস ও সিরিয়া অভিযানের খোদায়ী নির্দেশ শোনাবার পূর্বে পয়গম্বরসুলভ বিচক্ষণতা ও উপদেশের মাধ্যমে বনী-ইসরাঈলকে প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিনি বললেন ঃ

اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا

وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ

''তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র নেয়ামতকে স্মরণ কর। তিনি তোমাদের

মধ্যে অনেক পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, তোমাদেরকে রাজ্যের অধিপতি করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন নেয়ামত দিয়েছেন,যা বিশ্বজগতের কেউ পায়নি।

এতে তিনটি নেয়ামতের কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি আধ্যাত্মিক নেয়ামত; অর্থাৎ, তাঁর সম্প্রদায়ে অব্যাহতভাবে বহু পয়গম্বর প্রেরণ। এর চাইতে বড় পারলৌকিক সম্মান আর কিছু হতে পারে না। তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে যে, বনী-ইসরাঈলের মত এত অধিক সংখ্যক পয়গম্বর অপর কোন উম্মতে হয়নি।

হাদীসবিদ ইবনে আবী হাতেম আ'মাশের রেওয়ায়েত অনুযায়ী বর্ণনা করেন যে, বনী-ইসরাঈলের শেষ পর্বে যা হযরত মূসা আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়, তাতেই এ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক হাজার পয়গম্বর প্রেরিত হন। আয়াতে বর্ণিত দ্বিতীয় নেয়ামতটি হচ্ছে পার্থিব ও বাহ্যিক। অর্থাৎ, তাদেরকে রাজ্য দান। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনী-ইসরাঈল সুদীর্ঘ কাল ফেরাউন ও ফেরাউন বংশীয়দের ক্রীতদাসরূপে দিনরাত অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছিল। আজ আল্লাহ্ তাআলা ফেরাউন ও তার বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে বনী-ইসরাঈলকে তার রাজ্যের অধিপতি করে দিয়েছেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, পয়গম্বরগণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ অর্থাৎ, তোমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককে পয়গম্বর করেছেন। এর অর্থ এই যে, সমগ্র জাতি পয়গম্বর ছিল না। বাস্তব সত্যও তাই। পয়গম্বর কয়েকজনই হন। অবশিষ্ট গোটা জাতি তাদের উম্মত ও অনুসারী হয়। কিন্তু এখানে জাগতিক রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا অর্থাৎ, তোমাদেরকে রাজ্যাধিপতি করে দিয়েছেন। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমাদের সবাইকে রাজা করে দিয়েছেন। ملوك শব্দটি ملك এর বহুবচন। সাধারণ পরিভাষায় এর অর্থ অধিপতি, বাদশাহ, রাজা। একথা সবাই জানে যে, গোটা জাতি যেমন নবী ও পয়গম্বর হয় না, তেমনি কোনদেশে গোটা জাতি বাদশাহ বা রাজাও হয় না। বরং জাতির এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি শাসন কার্য পরিচালনা করে। অবশিষ্ট জাতি তাদের অধীনস্থ হয়ে থাকে। কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের সবাইকে বাদশাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এর একটি কারণ বয়ানুল —কোরআনে এক বুযুর্গের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, কোন জাতির মধ্য থেকে কেউ বাদশাহ হলে সাধারণ পরিভাষায় তার রাজত্ব ও সাম্রাজ্যকে গোটা জাতির দিকে সম্বন্ধ করা হয়। উদাহরণতঃ ইসলামের মধ্য যুগের বাদশাহ্দের রাজত্বকে বনী-উমাইয়া ও বনী আব্বাসের রাজত্ব বলা হয়। এমনিভাবে ভারতবর্ষে গযনবী বংশের রাজত্ব, ঘৌরী বংশের রাজত্ব, মোঘল বংশের রাজত্ব অতঃপর ইংরেজদের রাজত্বকে সমগ্র জাতির দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই যে জাতির একজন বাদশাহ্ হয়, সে জাতির সবাইকে বাদশাহ্ বলে দেয়া হয়।

এই বিশেষ বাচনভঙ্গি অনুযায়ী কোরআন পাক সমগ্র বনী-ইসরাঈলকে রাজ্যাধিপতি বলে দিয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে জনগণের রাষ্ট্র। জনগণই স্বীয় রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করার অধিকারী এবং জনগণই সম্মিলিত মত দ্বারা তাঁকে অপসারণও করতে পারে। তাই দেখার ক্ষেত্রে যদিও একজন রাষ্ট্রপ্রধান হন, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণই।

তৃতীয় নেয়ামত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার নেয়ামতের সমষ্টি। বলা হয়েছে ঃ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ অর্থাৎ, তোমাদেরকে এমনসব নেয়ামত দিয়েছেন, যা বিশ্বজগতের আর কাউকে দেননি। আভ্যন্তরীণ সম্মান, নবুওয়ত এবং রেসালতও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া বাহ্যিক রাজত্ব এবং অর্থ-সম্পদও এরই মধ্যে পরিগণিত। প্রশ্ন হতে পারে, কোরআনের উক্তি অনুযায়ী মুসলিম সম্প্রদায় অন্য সব উম্মতের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কোরআনের উক্তি كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ প্রভৃতি বাক্য এবং وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا অসংখ্য হাদীসও এ বক্তব্য সমর্থন করে। উত্তর এই যে, আয়াতে বিশ্ব জগতের ঐসব লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা মূসা (আঃ)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তখন সমগ্র বিশ্বের কেউ ঐসব নেয়ামত পায়নি, যা বনী-ইসরাঈল পেয়েছিল। পরবর্তী যুগের কোন উম্মত যদি আরও বেশী নেয়ামত লাভ করে, তবে তা আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বর্ণিত মূসার উক্তিটি ছিল ঐ নির্দেশ বর্ণনার ভূমিকা, যা পরবর্তী আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা সে পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন।

**পবিত্র ভূমি বলে কোন্ ভূমি বোঝানো হয়েছে ঃ** এ প্রশ্নে তফসীরবিদগণের মত বাহ্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন। কারও মতে বায়তুল-মুকাদ্দাস, কারও মতে কুদ্স শহর ও ইলিয়া এবং কেউ কেউ বলেন ঃ আরিহা শহর—যা জর্দান নদী ও বায়তুল মুকাদ্দাসের মধ্যস্থলে বিশ্বের একটি প্রাচীনতম শহর যা পূর্বেও ছিল এবং এখনও আছে। হযরত মূসা (আঃ)-এর আমলে এ শহরের অত্যাশ্চর্য জাঁক-জমক ও বিস্তৃতি ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, এ শহরের এক হাজার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ছিল। প্রতি অংশে এক হাজার করে বাগান ছিল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, পবিত্র ভূমি বলে দামেস্ক ও ফিলিস্তিনকে এবং কারও মতে জর্দানকে বোঝানো হয়েছে। হযরত কাতাদাহ্ বলেন ঃ সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। কা'ব আহবার বলেন ঃ আমি আল্লাহ্র কিতাবে (সম্ভবতঃ তৌরাতে) দেখেছি যে, সমগ্র সিরিয়ায় আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ ধন-ভাণ্ডার রয়েছে এবং এতে আল্লাহ্র অনেক প্রিয় বান্দা রয়েছেন। পয়গম্বরগণের জন্মস্থান ও বাসস্থান হওয়ার কারণে একে পবিত্র ভূমি বলা হয়।

এক রেওয়ায়েতে আছে, একদিন হযরত ইবরাহীম (আঃ) লেবাননের পাহাড়ে আরোহণ করলে আল্লাহ্ তাআলা বললেন ঃ ইবরাহীম, এখান থেকে দৃষ্টিপাত কর। যে পর্যন্ত তোমার দৃষ্টি পৌঁছাবে, আমি তার সবটুকুকে পবিত্র ভূমি করে দিলাম। ইবনে-কাছীর ও মাযহারী তফসীর গ্রন্থ থেকে এসব রেওয়ায়েত উল্লেখ করা হয়েছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। সর্বশেষ রেওয়ায়েত অনুযায়ী সমগ্র সিরিয়াই পবিত্র ভূমি। তবে বর্ণনায় কেউ সিরিয়ার অংশবিশেষকে এবং কেউ সমগ্র সিরিয়াকে বর্ণনা করেছেন।

قَالُوا يَا مُوسَىٰ এর আগে আল্লাহ্ তাআলা মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে বনী-ইসরাঈলকে আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ করে সিরিয়া

দখল করতে বলেছিলেন। সাথে সাথে এ সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, সিরিয়ার ভূখণ্ড তাদের ভাগ্যে লেখা হয়ে গেছে। কাজেই তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

উল্লেখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সত্ত্বেও বনী-ইসরাঈল চিরাচরিত ঔদ্ধত্য ও বক্র স্বভাবের কারণে এ নির্দেশ পালনে স্বীকৃত হল না; বরং মূসা (আঃ)-কে বলল ঃ হে মূসা, এ দেশে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বাস করে। যতদিন এ দেশ তাদের দখলে থাকবে, ততদিন আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। যদি তারা অন্য কোথাও চলে যায়, তবে আমরা সেখানে যেতে পারি।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, ইকরিমা, আলী ইবনে আবী তালহা প্রমুখ তফসীরবিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তখন সিরিয়া ও বায়তুল-মুকাদ্দাস আমালেকা সম্প্রদায়ের দখলে ছিল। তারা ছিল আদ সম্প্রদায়ের একটি শাখা। দৈহিক দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত সুঠাম, বলিষ্ট ও ভয়াবহ আকৃতিবিশিষ্ট ছিল। তাদেরই সাথে জেহাদ করে বায়তুল-মুকাদ্দাস অধিকার করার নির্দেশ মূসা আলাইহিসসালাম ও তাঁর সম্প্রদায়কে দেয়া হয়েছিল।

মূসা আলাইহিসসালাম আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্যে বনী-ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হলেন। উদ্দেশ্য ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌছা। জর্দান নদী পার হয়ে বিশ্বের প্রাচীনতম শহর আরিহায় পৌছে শিবির স্থাপন করলেন। বনী-ইসরাঈলের দেখা-শোনার জন্যে বার জন সর্দার নির্বাচন করার কথা পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মূসা (আঃ) এই বার জন সর্দারকে শত্রুদের অবস্থা ও রণাঙ্গণের হাল-হকিকত জেনে আসার জন্যে পাঠান। বায়তুল মুকাদ্দাসের অদূরে শহরের বাইরে আমালেকা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির সাথে তাদের দেখা হয়। সে একাই বার জনকে গ্রেফতার করে বাদশাহ্র সামনে উপস্থিত করে বলল ঃ এরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশে এসেছে। শাহী দরবারে নানাহ পরামর্শের পর তাদেরকে মুক্ত করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল—যাতে তারা স্বজাতির কাছে পৌছে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে আমালেকা জাতির শৌর্য-বীর্যের কাহিনী বর্ণনা করে। ফলে আক্রমণ তো দূরের কথা, ভীত হয়ে এদিকে মুখ করার সাহসও তারা হারিয়ে ফেলে।

এস্থলে অধিকাংশ তফসীর গ্রন্থে উল্লেখিত ইসরাঈলী রেওয়ায়েতসমূহে নাতিদীর্ঘ কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে এবং আমালেকা সম্প্রদায়ের উল্লেখিত ব্যক্তির নাম বলা হয়েছে আউজ ইবনে ওনুক। এসব রেওয়ায়েতে তার অদ্ভুত আকার-আকৃতি ও শক্তি-সাহসকে এমন অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তা সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে উদ্ধৃত করাও কঠিন।

ইবনে-কাছীর বলেন ঃ আউজ ইবনে ওনুকের যেসব কিচ্ছা এসব ইসরাঈলী রেওয়ায়েতে স্থান পেয়েছে, সেগুলো কোন বুদ্ধিমানের কাছে গ্রহণীয় নয় এবং শরীয়তেও এগুলোর কোন বৈধতা নেই—এ সবই মিথ্যা ও বানোয়াট। আসল ব্যাপার এতটুকু যে, আমালেকা সম্প্রদায় ছিল আদ সম্প্রদায়ের উত্তর পুরুষদের একটি অংশ। আদ সম্প্রদায়ের ভয়াবহ আকার-আকৃতির কথা স্বয়ং কোরআন পাক বর্ণনা করেছে। তাদের বিশালাকৃতি ও শক্তি-সাহস প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের এক ব্যক্তি বনী-ইসরাঈলের বার ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল।

মোটকথা, বনী-ইসরাঈলের বার জন সর্দার আমালেকাদের কয়েদখানা থেকে মুক্ত হয়ে আরিহায় স্বজাতির কাছে ফিরে এল। তারা মূসা (আঃ)-এর কাছে এ বিস্ময়কর জাতি ও তাদের অবিশ্বাস্য শৌর্যবীর্যের কাহিনী বর্ণনা করল। হযরত মূসা (আঃ) এসব কাহিনী শুনে এতটুকুও ভীত হলেন না। কারণ, আল্লাহ্ তাআলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে বিজয় ও সাফল্যের বাণী শুনিয়ে রেখেছিলেন।

হযরত মূসা তো তাদের শৌর্যবীর্যের অবস্থা শুনে স্বস্থানে পাহাড়ের মত দৃঢ়তা সহকারে জেহাদের প্রস্তুতিতে লেগে রইলেন। কিন্তু বনী-ইসরাঈলকে নিয়েই সমস্যা। তারা যদি প্রতিপক্ষের অসাধারণ শক্তি-সাহসের কথা জেনে ফেলে, তবে নিশ্চিতই ভরাডুবি। তাই তিনি বার জন সর্দারকে আমালেকা সম্প্রদায়ের অবস্থা বনী-ইসরাঈলের কাছে ব্যক্ত করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু তা হল না। তারা প্রত্যেকেই গোপনে গোপনে বন্ধু-বান্ধবের কাছে তা ব্যক্ত করে দিল। শুধু ইউশা ইবনে নূন ও কালেব ইবনে ইউকেন্না নামক দুব্যক্তি মূসা (আঃ)-এর নির্দেশ পালন করে তা কারও কাছে প্রকাশ করল না।

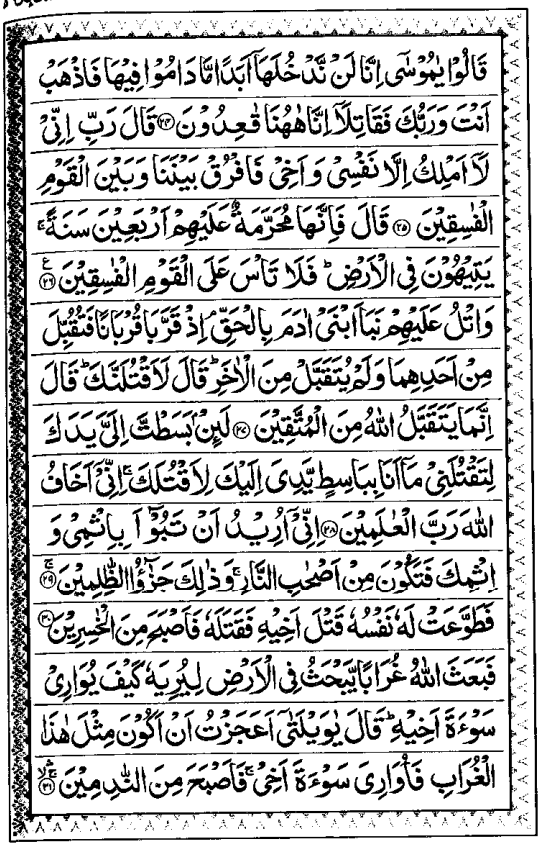

قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ
اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ
لَآ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِىْ وَاَخِىْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ
الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَاِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً
يَتِيْهُوْنَ فِى الْاَرْضِ ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿٢٦﴾
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ
مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ۗ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ۗ قَالَ
اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٧﴾ لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ
لِتَقْتُلَنِىْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّىْٓ اَخَافُ
اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾ اِنِّىْٓ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِىْ وَ
اِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ﴿٢٩﴾
فَطَوَّعَتْ لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٣٠﴾
فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِى الْاَرْضِ لِيُرِيَهٗ كَيْفَ يُوَارِىْ
سَوْءَةَ اَخِيْهِ ۗ قَالَ يٰوَيْلَتٰٓى اَعَجَزْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِثْلَ هٰذَا
الْغُرَابِ فَاُوَارِىَ سَوْءَةَ اَخِىْ ۚ فَاَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِيْنَ ﴿٣١﴾

*(২৪) তারা বলল ঃ হে মূসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। (২৫) মূসা বলল ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি শুধু নিজের উপর ও নিজের ভাইয়ের উপর ক্ষমতা রাখি। অতএব, আপনি আমাদের মধ্যে ও এ অবাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করুন। (২৬) বললেন ঃ এ দেশ চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্যে হারাম করা হল। তারা ভূপৃষ্ঠে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরবে। অতএব, আপনি অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না। (২৭) আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শুনান। যখন তারা উভয়েই কিছু উৎসর্গ নিবেদন করেছিল, তখন তাদের একজনের উৎসর্গ গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি। সে বলল ঃ আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে বলল ঃ আল্লাহ্ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেই তো গ্রহণ করেন। (২৮) যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর,তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা, আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহ্কে ভয় করি। (২৯) আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। অতঃপর তুমি দোযখীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি। (৩০) অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। অনন্তর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (৩১) আল্লাহ্ এক কাক প্রেরণ করলেন। সে মাটি খনন করছিল-যাতে তাকে শিক্ষা দেয় যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ কিভাবে আবৃত করবে। সে বললঃ আফসোস, আমি কি এ কাকের সমতুল্যও হতে পারলাম না যে, আপন ভ্রাতার মৃতদেহ আবৃত করি। অতঃপর সে অনুতাপ করতে লাগল।*

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কিন্তু বনী-ইসরাঈল যেখানে পয়গম্বরের কথার প্রতিই কর্ণপাত করল না, সেখানে তাদের উপদেশের আর মূল্য কি? তারা পূর্বের জওয়াবই আরও বিশ্রী ভঙ্গিতে পুনরাবৃত্তি করলঃ فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ অর্থাৎ, আপনি ও আপনার আল্লাহ্ উভয়ে গিয়েই যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব। বনী-ইসরাঈল বিদ্রূপের ভঙ্গিতে একথা বললে, তা পরিষ্কার কুফ্র হতো এবং অতঃপর তাদের সাথে মূসা (আঃ)-এর অবস্থান করা, তীহ্ প্রান্তরে দোয়া করা ইত্যাদি সম্ভবপর হতো না যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হচ্ছে।

এ কারণে তফসীরবিদগণ উপরোক্ত বাক্যের অর্থ এরূপ সাব্যস্ত করেছেন—আপনি যান এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আপনার আল্লাহ্ই আপনার সাহায্য করবেন, আমরা সাহায্য করতে অক্ষম। এ অর্থের দিক দিয়ে বনী-ইসরাঈলের জওয়াবটি কুফরের পরিধি অতিক্রম করে যায়—যদিও কথাটি অত্যন্ত বিশ্রী ও পীড়াদায়ক। এ কারণেই তাদের এ বাক্যটি প্রবাদ বাক্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

বদরযুদ্ধে নিরস্ত্র ও ক্ষুধার্ত মুসলমানদের মোকাবেলায় এক হাজার সশস্ত্র জওয়ানের বাহিনী প্রস্তুত হয়ে ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ দৃশ্য দেখে আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করতে লাগলেন। এতে ছাহাবী হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! খোদার কসম, আমরা কস্মিন কালেও ঐকথা বলব না, যা মূসা (আঃ)-কে তাঁর স্বজাতি বলেছিল فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে থেকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করব। আপনি নিশ্চিন্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

**হাবিল ও কাবীলের কাহিনী ঃ** আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন-আপনি আহ্লে-কিতাবদেরকে অথবা সমগ্র উম্মতকে আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কাহিনী সত্য সত্য বর্ণনা করে শুনিয়ে দিন।

কোরআন মজীদে অভিনিবেশকারী মাত্রই জানে যে, কোরআন পাক কোন কিচ্ছা-কাহিনী অথবা ইতিহাস গ্রন্থ নয় যে, তাতে কোন ঘটনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করা হবে। এতদসত্ত্বেও অতীত ঘটনাবলী এবং বিগত জাতিসমূহের ইতিবৃত্তের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে। এগুলোই ইতিহাসের আসল প্রাণ। তন্মধ্যে অনেক অবস্থা ও ঘটনা এমনও রয়েছে, যেগুলোর ওপর শরীয়তের বিভিন্ন বিধি-বিধান ভিত্তিশীল। এসব উপকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে কোরআন পাকের সামগ্রিক রীতি এই যে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে অধিকাংশ স্থানে পূর্ণ ঘটনা এক জায়গায় বর্ণনা করে না; বরং ঘটনার যে অংশের সাথে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সম্পর্ক থাকে সে অংশটুকুই বর্ণনা করা হয়।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কাহিনীটিও এই বিজ্ঞ রীতির ভিত্তিতে বর্ণনা করা হচ্ছে। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে অনেক শিক্ষা ও উপদেশ রয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে শরীয়তের অনেক বিধি-বিধানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এখন প্রথমে আয়াতের শব্দাবলীর ব্যাখ্যা এবং তৎপ্রসঙ্গে আসল কাহিনী শুনুন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান বর্ণনা করা হবে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বনী-ইসরাইলের প্রতি জেহাদের নির্দেশ এবং তাতে

তাদের কাপুরুষতা ও ভীরুতা বর্ণনা করা হয়েছিল। এর বিপরীতে আলোচ্য কাহিনীতে অন্যায় হত্যার অনিষ্ট ও ধ্বংসকারিতা বর্ণনা করে জাতিকে মিতাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, সত্যের সমর্থনে এবং মিতাচার থেকে পেছনে হটা যেমন ভুল, তেমনি অন্যায় হত্যাকাণ্ডে এগিয়ে যাওয়া ইহকাল ও পরকালকে বরবাদ করার শামিল।

প্রথম আয়াতে ابْنَيْ اٰدَمَ শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। সেমতে প্রত্যেককেই ابن ادم বা আদম সন্তান বলা যায়। কিন্তু সাধারণ তফসীরবিদগণের মতে এখানে ابْنَيْ اٰدَمَ বলে হযরত আদমের ঔরসজাত পুত্রদ্বয় হাবিল ও কাবিলকে বোঝানো হয়েছে।

**ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা ও সততা অপরিহার্য ঃ** তাদের কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশে বলা হয়েছে ঃ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ অর্থাৎ, তাদেরকে পুত্রদ্বয়ের কাহিনী বিশুদ্ধ ও বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী শুনিয়ে দিন। এতে بِالْحَقِّ শব্দ দ্বারা ঐতিহাসিক ঘঠনাবলী বর্ণনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বর্ণনায় খুবই সাবধানতা প্রয়োজন এবং এতে কোনরূপ মিথ্যা জালিয়াতি ও প্রতারণার মিশ্রণ না থাকা চাই এবং প্রকৃত ঘটনা পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত না হওয়া চাই।—(ইবনে কাসীর) কোরআন পাক শুধু এখানেই নয়, বরং অন্যান্য জায়গায়ও এ মূলনীতি অনুসরণ-অনুকরণ করার নির্দেশ দিয়েছে।

এছাড়া এ শব্দ দ্বারা কোরআন পাকের সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গকে বোঝানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাহ্যতঃ নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও হাজারো বছর পূর্বেকার ঘটনাবলী যেভাবে বিশুদ্ধ ও সত্য সত্য বর্ণনা করেছেন, তার কারণ খোদায়ী ওহী ও নবুওয়ত ছাড়া আর কি হতে পারে?

এ ভূমিকার পর কোরআন পাক পুত্রদ্বয়ের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেঃ

اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ

আভিধানিক দিক দিয়ে যে বস্তু কারও নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে 'কোরবান' বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় কোরবান ঐ জন্তুকে বলে যাকে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশে যবেহ করা হয়।

হযরত আদম আলাইহিস সালামের পুত্রদ্বয়ের কোরবানীর ঘটনাটি বিশুদ্ধ ও শক্তিশালী সনদসহ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর একে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সর্বস্তরের আলেমদের সর্বসম্মত উক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। ঘটনাটি এই ঃ যখন আদম ও হাওয়া (আঃ) পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়,তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা—এরূপ যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করত। তখন ভ্রাতা-ভগিনী ছাড়া হযরত আদমের আর কোন সন্তান ছিল না। অথচ ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না। তাই আল্লাহ্ তাআলা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (আঃ)-এর শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভ থেকে যে যমজ পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভ্রাতা-ভগিনী গণ্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্যে প্রথম গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারিনী কন্যা সহোদরা ভগিনী গণ্য হবে না। তাদের পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রে কাবিলের সহজাত সহোদরা ভগিনীটি ছিল পরমাসুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত কন্যাটি ছিল কুশ্রী ও কদাকার। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত কুশ্রী কন্যা কাবিলের ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জেদ ধরল যে, আমার সহজাত ভগিনীকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। হযরত আদম (আঃ) তাঁর শরীয়তের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কাবিলের আব্দার প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশে বললেন ঃ তোমরা উভয়েই আল্লাহ্র জন্যে নিজ নিজ কোরবানী পেশ কর। যার কোরবানী পরিগৃহিত হবে, সেই কন্যার পানিগ্রহণ করবে। হযরত আদম আলাইহিস সালামের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, যে সত্য পথে আছে, তার কোরবানীই গৃহীত হবে।

তৎকালে কোরবানী গৃহিত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কোরবানীকে ভস্মিভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কোরবানী অগ্নি ভস্মিভূত করত না, তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হত।

হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কোরবানী করল। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কোরবানীর জন্যে পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কোরবানীটি ভস্মীভূত করে দিল এবং কাবিলের কোরবানী যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল ঃ لَاَقْتُلَنَّكَ অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব।

হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত বাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবিলের প্রতি তার সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে বলল ঃ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলার নিয়ম এই যে, তিনি খোদাভীরু পরহেজগারের কর্মই গ্রহণ করেন। তুমি খোদাভীতি অবলম্বন করলে তোমার কোরবানীও গৃহীত হত। তুমি তা করনি, তাই কোরবানী প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এতে আমার দোষ কি?

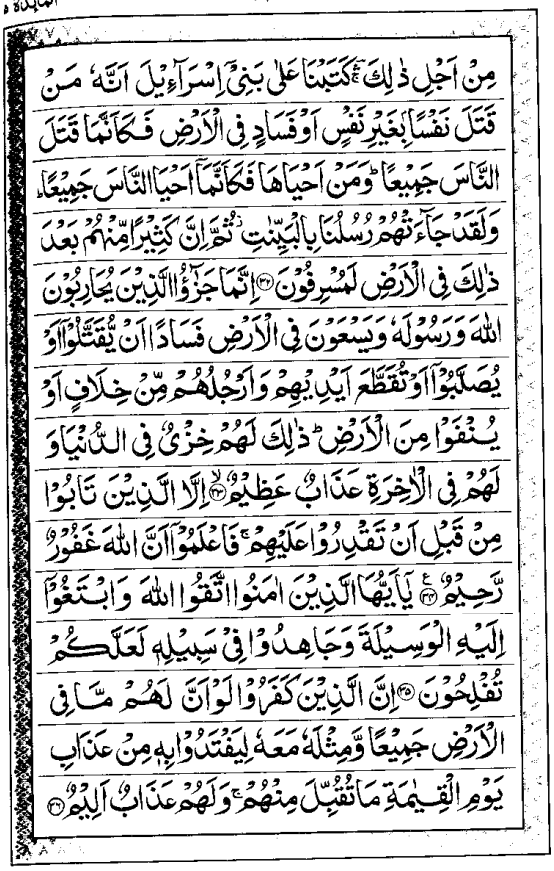

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ أَنَّهٗ مَنْ
قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيْعًا ۭ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۭ
وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۡ ثُمَّ إِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ
ذٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ۝ إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُّقَتَّلُوْٓا أَوْ
يُصَلَّبُوْٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ
يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۭ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَ
لَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا
إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ۝ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي
الْأَرْضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهٗ مَعَهٗ لِيَفْتَدُوْا بِهٖ مِنْ عَذَابِ
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ۝

*(৩২) এ কারণেই আমি বনী-ইসরাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। বস্তুতঃ এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমাতিক্রম করে। (৩৩) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্যে পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি। (৩৪) কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তওবা করে; জেনে রাখ, আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, দয়ালু। (৩৫) হে মুমিনগণ, আল্লাহ্কে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও। (৩৬) যারা কাফের, যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সমুদয় সম্পদ এবং তৎসহ আরও তদনুরূপ সম্পদ থাকে আর এগুলো বিনিময়ে দিয়ে কিয়ামতের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়, তবুও তাদের কাছ থেকে তা কবুল করা হবে না। তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।*

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**কোরআনী আইনের অভিনব ও বৈপ্লবিক পদ্ধতি ঃ** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে হত্যাকাণ্ড এবং তার গুরুতর অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াত এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি ও চুরির শাস্তি বর্ণিত হয়েছে। ডাকাতি ও চুরির শাস্তির মাঝখানে খোদাভীতি ও এবাদতের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কোরআন পাকের এ পদ্ধতি অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে মানসিক বিপ্লব সৃষ্টি করে। মানব রচিত দণ্ডবিধির মত কোরআন পাক শুধু অপরাধ ও শাস্তি বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং প্রত্যেক অপরাধ ও শাস্তির সাথে খোদাভীতি ও পরকাল কল্পনা উপস্থাপন করে মানুষের ধ্যান-ধারণাকে এমন এক জগতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, যার কল্পনা মানুষকে যাবতীয় অপরাধ ও গোনাহ্ থেকে পবিত্র করে দেয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, জনমনে আল্লাহ্ তাআলা ও আখেরাতের ভয় সৃষ্টি করা ছাড়া জগতের কোন আইন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীই অপরাধ দমনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। কোরআন পাকের এই বিজ্ঞজনোচিত পদ্ধতিই জগতে অভূতপূর্ব বিপ্লব এনেছে এবং এমন লোকদের একটি সমাজ গঠন করেছে, যারা পবিত্রতায় ফেরেশতাদের চাইতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

**শরীয়তের শাস্তি তিন প্রকার ঃ** চুরি ও ডাকাতির শাস্তি এবং সংশ্লিষ্ট আয়াতের তফসীর বর্ণনা করার পূর্বে এসব শাস্তি সম্পর্কে শরীয়তের পরিভাষার কিছুটা ব্যাখ্যা আবশ্যক। কেননা, এসব পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে অনেক শিক্ষিত লোকের মনেও নানাবিধ প্রশ্ন দেখা দেয়। জগতের সাধারণ আইনে অপরাধ সম্পর্কিত সব শাস্তিকেই 'দণ্ডবিধি' নামে অভিহিত করা হয়। 'ভারতীয় দণ্ডবিধি', 'বাংলাদেশ দণ্ডবিধি' ইত্যাদি নামে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সর্বপ্রকার অপরাধ ও সব ধরনের শাস্তিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত এরূপ নয়। ইসলামী শরীয়তে অপরাধের শাস্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ হুদুদ, কেছাছ ও তা'যীরাত। অর্থাৎ, দণ্ডবিধি। এগুলোর সংজ্ঞা ও অর্থ জানার পূর্বে প্রথমতঃ একথা জেনে নেয়া জরুরী যে, যেসব অপরাধের দরুন অন্য মানুষের কষ্ট অথবা ক্ষতি হয়, তাতে সৃষ্টজীবের প্রতিও অন্যায় করা হয় এবং স্রষ্টারও নাফরমানী করা হয়। তাই এ জাতীয় অপরাধে 'হক্কুল্লাহ' (আল্লাহ্র হক) এবং 'হক্কুল আবদ' (বান্দার হক) উভয়টিই বিদ্যমান থাকে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উভয়ের কাছেই অপরাধী বলে বিবেচিত হয়।

কিন্তু কোন কোন অপরাধে বান্দার হক এবং কোন কোন অপরাধে আল্লাহ্র হক প্রবল থাকে এবং এ প্রাবল্যের উপর ভিত্তি করেই বিধি-বিধান রচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত ঃ একথা জানা জরুরী যে, ইসলামী শরীয়ত বিশেষ বিশেষ অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করেনি; বরং বিচারকের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। বিচারক স্থান, কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করে অপরাধ দমনের জন্যে যেরূপ ও যতটুকু শাস্তির প্রয়োজন মনে করবেন, ততটুকুই দেবেন। প্রত্যেক স্থান ও কালের ইসলামী সরকার যদি শরীয়তের রীতিনীতি বিবেচনা করে বিচারকদের ক্ষমতার উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং অপরাধসমূহের শাস্তির কোন পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়েয। বর্তমান শতাব্দীতে তাই হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সব ইসলামী দেশে এ ব্যবস্থাই প্রচলিত রয়েছে।

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, যেসব অপরাধের কোন শাস্তি কোরআন ও সুন্নাহ্ নির্ধারণ করেনি,বরং বিচারকদের অভিমতের উপর ন্যস্ত করেছে, সেসব শাস্তিকে শরীয়তের পরিভাষায় 'তাযিরাত' তথা দণ্ড বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি কোরআন ও সুন্নাহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেগুলো দু'রকম ঃ (এক) যেসব অপরাধে আল্লাহ্র হকের পরিমাণ প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে 'হদ' বলা হয়। আর 'হদ'-এরই বহুবচন 'হুদূদ'। (দুই) যেসব অপরাধে বান্দার হককে শরীয়তের বিচারে প্রবল ধরা হয়েছে, সেগুলোর শাস্তিকে বলা হয় 'কেছাছ'। কোরআন পাক হুদূদ ও কেছাছ পূর্ণ ব্যাখ্যা সহকারে নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছে। আর দণ্ডনীয় অপরাধের বিবরণকে রসূলের বর্ণনা ও সমকালীন বিচারকদের অভিমতের উপর ছেড়ে দিয়েছে।

সারকথা, কোরআন পাক যেসব অপরাধের শাস্তিকে আল্লাহ্র হক হিসেবে নির্ধারণ করে জারি করেছে, সেসব শাস্তিকে 'হুদূদ' বলা হয় এবং যেসব শাস্তিকে বান্দার হক হিসেবে জারি করেছে, সেগুলোকে 'কেছাছ' বলা হয়। পক্ষান্তরে যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করেনি, সে জাতীয় শাস্তিকে বলা হয় 'তা'যীর' তথা 'দণ্ড'। শাস্তির এ প্রকার তিনটির বিধান অনেক বিষয়েই বিভিন্ন। যারা নিজেদের পরিভাষার ভিত্তিতে প্রত্যেক অপরাধের শাস্তিকে দণ্ড বলে এবং শরীয়তের পরিভাষাগত পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তারা শরীয়তের বিধি-বিধানে অনেক বিভ্রান্তির সম্মুখীন হয়।

দণ্ডগত শাস্তিকে অবস্থানুযায়ী লঘু থেকে লঘুতর, কঠোর থেকে কঠোরতর এবং ক্ষমাও করা যায়। এব্যাপারে বিচারকদের ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু হুদূদের বেলায় কোন সরকার, শাসনকর্তা অথবা বিচারকই সামান্যতম পরিবর্তন, লঘু অথবা কঠোর করার অধিকারী নয়। স্থান ও কাল ভেদেও এতে কোন পার্থক্য হয় না এবং কোন শাসক ও বিচারক তা ক্ষমাও করতে পারে না। শরীয়তে হুদূদ মাত্র পাঁচটি ঃ ডাকাতি, চুরি, ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদ- এ চারটির শাস্তি কোরআনে বর্ণিত রয়েছে। পঞ্চমটি মদ্যপানের হদ। এটি সাহাবায়ে-কেরামের এজমা তথা ঐকমত্য দ্বারা প্রমাণিত। এভাবে মোট পাঁচটি অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত ও হুদূদরূপে চিহ্নিত হয়েছে। এসব শাস্তি যেমন কোন শাসক ও বিচারক ক্ষমা করতে পারে না, তেমনি তওবা করলেও ক্ষমা হয়ে যায় না। তবে খাঁটি তওবা দ্বারা আখেরাতের গোনাহ্ মাফ হয়ে সেখানকার হিসাব-কিতাব থেকে অব্যাহতি লাভ হতে পারে। তন্মধ্যে শুধু ডাকাতির শাস্তির বেলায় একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। ডাকাত যদি গ্রেফতারীর পূর্বে তওবা করে এবং তার আচার-আচরণের দ্বারাও তওবার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তবে সে হদ থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু গ্রেফতারীর পরবর্তী তওবা ধর্তব্য নয়। অন্যান্য হুদূদ তওবা দ্বারাও মাফ হয় না। এ তওবা গ্রেফতারীর পূর্বে হোক অথবা পরে। সব দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রবণ করা যায়; কিন্তু হুদূদের বেলায় সুপারিশ করা এবং তা শ্রবণ করা দুই-ই নাজায়েয। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হুদূদের শাস্তি সাধারণতঃ কঠোর। এগুলো প্রয়োগ করার আইনও নির্মম। অর্থাৎ, কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকারী নয়। কিন্তু সাথে সাথে সামগ্রিক ব্যাপারে সমতা বিধানের উদ্দেশে অপরাধ এবং অপরাধ প্রমাণের শর্তাবলীও অত্যন্ত কঠোর করা হয়েছে। নির্ধারিত শর্তাবলীর মধ্য থেকে যদি কোন একটি শর্তও অনুপস্থিত থাকে, তবে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ, অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহ পাওয়া গেলেও হদ প্রয়োগ করা যায় না। এ ব্যাপারে শরীয়তের স্বীকৃত আইন হচ্ছে الحدود تندرئ بالشبهات অর্থাৎ, হুদূদ সামান্যতম সন্দেহের কারণেই অকেজো হয়ে পড়ে।

এ ক্ষেত্রে বুঝে নেয়া উচিত যে, কোন সন্দেহ অথবা কোন শর্তের অনুপস্থিতির কারণে হদ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছাড়পত্র পেয়ে যাবে যার ফলে তার অপরাধ প্রবণতা আরও বেড়ে যাবে; বরং বিচারক অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে তাকে দণ্ডগত শাস্তি দেবেন। শরীয়তের দণ্ডগত শাস্তিসমূহ সাধারণতঃ দৈহিক ও আর্থিক। এগুলো দৃষ্টান্তমূলক হওয়ার কারণে অপরাধ দমনে খুবই কার্যকর। ধরুন, ব্যভিচার প্রমাণে মাত্র তিন জন সাক্ষী পাওয়া গেল এবং তারা সবাই নির্ভরযোগ্য ও মিথ্যার সন্দেহ থেকে মুক্ত। কিন্তু আইনানুযায়ী চতুর্থ সাক্ষী না থাকার কারণে হদ জারি করা যাবে না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি অথবা বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে, বরং বিচারক তাকে অন্য কোন উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবেন, যা বেত্রাঘাতের আকারে হতে পারে।

তেমনিভাবে চুরি প্রমাণের জন্যে নির্ধারিত শর্তসমূহে কোন ত্রুটি অথবা সন্দেহ দেখা দেয়ার কারণে চোরের হাত কেটে দেয়া যাবে না বটে, কিন্তু এমতাবস্থায় সে সম্পূর্ণ মুক্তও হয়ে যাবে না; বরং তাকে অবস্থানুযায়ী অন্য দণ্ড দেয়া হবে।

কেছাছের শাস্তিও হুদূদের মত কোরআন পাকে নির্ধারিত। অর্থাৎ, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ সংহার করা হবে এবং জখমের বিনিময়ে সমান জখম করা হবে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হুদূদকে আল্লাহ্র হক হিসেবে প্রয়োগ করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না এবং হদ অব্যবহার্য হবে না। উদাহরণতঃ যার অর্থ চুরি যায়, সে ক্ষমা করলেও চোরের নির্ধারিত শাস্তি অপ্রযোজ্য হবে না। কিন্তু কেছাছ এর বিপরীত। কেছাছে বান্দার হক প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর এখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে কেছাছ হিসেবে তাকে মৃত্যুদণ্ডও করাতে পারে। জখমের কেছাছও তদ্রূপ। পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে যে, হুদূদ ও কেছাছ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ার অর্থ এই নয় যে, অপরাধী অবাধ ছুটি পেয়ে যাবে; বরং বিচারক দণ্ডমূলক শাস্তি যতটুকু উপযুক্ত মনে করবেন, দিতে পারবেন। কাজেই নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে হত্যাকারীদের সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যাবে—এরূপ আশঙ্কা করা ঠিক নয়। কেননা, হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য। সে তা ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণরক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অন্য কোন শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশঙ্কা রোধ করতে পারে।

وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ অর্থাৎ, আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ কর। وسيلة শব্দটি وسل ধাতু থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সংযোগ স্থাপন করা। এ শব্দটি س،ص উভয় বর্ণে প্রায় একই অর্থে আসে। পার্থক্য এতটুকু যে, وصل এর অর্থ যে কোনরূপে সাক্ষাৎ করা ও সংযোগ করা এবং وسل এর অর্থ আগ্রহও সম্প্রীতি সহকারে সাক্ষাৎ করা।—(ছেহাহ্, জওহরী, মুফরাদাতুল -কোরআন) তাই وصلة ও وصيله ঐ বস্তুকে বলে, যা দুই বস্তুর মধ্যে মিলন ও সংযোগ স্থাপন করে—তা আগ্রহ ও সম্প্রীতির মাধ্যমেই হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে। পক্ষান্তরে وسيله ঐ বস্তুকে বলা হয়, যা

একজনকে অপরজনের সাথে আগ্রহ ও সম্প্রীতি সহকারে সংযুক্ত করে দেয়।—(লিসানুল আরব, মুফরাদাতুল-কোরআন) وسيلة শব্দটির সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে হলে ঐ বস্তুকে বলা হবে, যা বান্দাকে আগ্রহ ও মহব্বত সহকারে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী করে দেয়। তাই পূর্ববর্তী মনীষী, ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ এবাদত, নৈকট্য, ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারা আয়াতে উল্লেখিত وسيلة শব্দের তফসীর করেছেন। হাকেমের বর্ণনা মতে হযরত হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, 'ওসীলা' শব্দ দ্বারা নৈকট্য ও আনুগত্য বোঝানো হয়েছে। ইবনে জরীর হযরত আ'তা (রাহঃ), মুজাহিদ (রাহঃ) ও হাসান বসরী (রাহঃ) থেকে এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

এ আয়াতের তফসীরে হযরত কাতাদাহ্ (রাহঃ) বলেন ঃ تقربوا اليه بطاعته والعمل بمايرضيه অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন কর তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির কাজ করে। অতএব, আয়াতের সারব্যাখ্যা এই দাঁড়ায় যে, ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অন্বেষণ কর।

মুসনাদে-আহ্‌মদ গ্রন্থে বর্ণিত এক ছহীহ্ হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ জান্নাতের একটি উচ্চ স্তরের নাম 'ওসিলা'। এর উর্ধ্বে কোন স্তর নেই। তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া কর যেন তিনি এ স্তরটি আমাকে দান করেন।

মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ যখন মুয়াযযিন আযান দেয়, তখন মুয়াযযিন যা বলে, তোমরাও তাই বল। এরপর দরূদ পাঠ কর এবং আমার জন্যে ওসীলার দোয়া কর।

এসব হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ওসীলা জান্নাতের একটি স্তর, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্য নির্দিষ্ট। আলোচ্য আয়াতে প্রত্যেক ঈমানদারকে ওসীলা অন্বেষণের নির্দেশ বাহ্যতঃ এর পরিপন্থী। উত্তর এই যে, হেদায়াতের সর্বোচ্চ স্থান যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে নির্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলো সব মুমিনই প্রাপ্ত হবে, তেমনি ওসীলার সর্বোচ্চ স্তর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) লাভ করবেন এবং এর নিম্নের স্তরগুলো মুমিনরা প্রাপ্ত হবে।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী তাঁর 'মকতুবাত' গ্রন্থে এবং কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী তফসীরে মাযহারীতে বর্ণনা করেন যে, ওসীলা শব্দটিতে প্রেম ও আগ্রহের অর্থ সংযুক্ত থাকায় বোঝা যায় যে, ওসীলার স্তরসমূহের উন্নতি আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহব্বতের উপর নির্ভরশীল। মহব্বত সৃষ্টি হয় সুন্নতের অনুসরণের দ্বারা।

কেননা, কোরআন বলে ঃ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (আমার অনুসরণ কর,তবেই আল্লাহ্ তোমাদেরকে মহব্বত করবেন।) তাই এবাদত, লেন-দেন, চরিত্র, সামাজিকতা তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে সুন্নতের যত বেশী অনুসরণ করবে, আল্লাহ্‌র মহব্বত সে ততবেশী অর্জন করতে পারবে এবং আল্লাহ্‌র প্রিয়জনে পরিণত হবে। মহব্বত যতবেশী বৃদ্ধি পাবে, নৈকট্যও ততবেশী অর্জিত হবে।

ওসীলা শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের তফসীর থেকে জানা গেল যে, যে বস্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তাই মানুষের জন্যে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা। ঈমান ও সৎকর্ম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত তেমনি পয়গম্বর ও সৎকর্মীদের সংসর্গ এবং মহব্বতও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এগুলোও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভেরই উপায়। এ কারণেই তাঁদেরকে ওসীলা করে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করা জায়েয। দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ওমর (রাঃ) হযরত আব্বাসকে ওসীলা করে বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা সে দোয়া কবুল করেছিলেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং জনৈক অন্ধ ছাহাবীকে এভাবে দোয়া করতে বলেছিলেন ঃ

(আল্লাহ্, আমি রহমতের নবী মুহাম্মদের ওসীলায় তোমার কাছে প্রার্থনা করছি) ।— (মানার)

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ
مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ﴿٣٧﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا
اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ
حَكِيْمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْۢ بَعْدِ ظُلْمِهٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ
يَتُوْبُ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٩﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ
يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٤٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا
يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا
اٰمَنَّا بِاَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ
هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ۙ لَمْ
يَاْتُوْكَ ۗ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ ۚ يَقُوْلُوْنَ
اِنْ اُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ وَاِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوْا ۗ
وَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهٗ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ۗ
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُّطَهِّرَ قُلُوْبَهُمْ ۗ لَهُمْ
فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿٤١﴾

*(৩৭) তারা দোযখের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না। তারা চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। (৩৮) যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে, তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। (৩৯) অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয় আল্লাহ্ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৪০) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্‌র নিমিত্তেই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য! তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। (৪১) হে রসূল, তাদের জন্যে দুঃখ করবেন না, যারা দৌড়ে গিয়ে কুফরে পতিত হয়; যারা মুখে বলেঃ আমরা মুসলমান, অথচ তাদের অন্তর মুসলমান নয় এবং যারা ইহুদী; মিথ্যা বলার জন্যে তারা গুপ্তচর বৃত্তি করে। তারা অন্যদলের গুপ্তচর, যারা আপনার কাছে আসেনি। তারা বাক্যকে স্বস্থান থেকে পরিবর্তন করে। তারা বলেঃ যদি তোমরা এ নির্দেশ পাও, তবে কবুল করে নিও এবং যদি এ নির্দেশ না পাও, তবে বিরত থেকো। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করতে চান, তার জন্যে আল্লাহ্‌র কাছে আপনি কিছু করতে পারবেন না। এরা এমনিই যে, আল্লাহ্ এদের অন্তরকে পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং পরকালে বিরাট শাস্তি।*

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সম্পর্কে প্রথমে দেখা দরকার যে, কোরআন পাক মাত্র চারটি অপরাধের শাস্তি স্বয়ং নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করেছে। শরীয়তের পরিভাষায় এগুলোকে 'হদ' বলা হয়। ডাকাতির শাস্তি ডান হাত বা বাম পা কর্তন করা, চুরির শাস্তি ডান হাত গিঁঠ থেকে কর্তন করা, ব্যভিচারের শাস্তি কোন কোন অবস্থায় একশ' বেত্রাঘাত এবং কোন কোন অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা এবং ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপের শাস্তি আশিটি বেত্রাঘাত। পঞ্চম 'হদ' মদ্যপানের শাস্তি ছাহাবীদের ঐকমত্যে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারিত হয়েছে। এ পাঁচটি ছাড়া সব অপরাধের সাজা বিচারকের বিবেচনাধীন; তিনি অপরাধ, অপরাধী এবং পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেরূপ ও যতটুকু শাস্তি উপযুক্ত মনে করবেন, দেবেন। এ ব্যাপারে জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শক্রমে শাস্তির সীমা নির্ধারণের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করাও জায়েয। যেমন, আজকাল এসেম্বলীর মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং বিচারক ও জজগণ নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মামলা-মোকদ্দমায় রায় দেন। তবে কোরআন ও ইজমা দ্বারা নির্ধারিত উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের শাস্তি পরিবর্তন করার ক্ষমতা কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী অথবা এসেম্বলীর নেই। কিন্তু এ পাঁচটির ক্ষেত্রেও যদি শরীয়তের নির্ধারিত সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা অপরাধ প্রমাণিত না হয় কিংবা অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর যেসব শর্তের অধীনে 'হদ' জারি করা হয়, সেগুলো পূরণ না হয়, তবে হদ জারি করা হবে না,বরং অন্য কোন দণ্ড দেয়া হবে। এতদসঙ্গে এ নীতিটিও স্বীকৃত যে, সন্দেহের সুযোগ অপরাধীরা ভোগ করতে পারবে। অপরাধ প্রমাণে কিংবা অপরাধের শর্তাবলীর মধ্য থেকে কোন একটিতে সন্দেহ দেখা দিলে হদ অব্যবহার্য হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শুধু অপরাধ প্রমাণিত হলেই সাধারণ দণ্ড দেয়া হবে।

এতে বোঝা গেল যে, উপরোক্ত পাঁচটি অপরাধের মধ্যে অনেক অবস্থায় হদ প্রয়োগ করা যাবে না, বরং বিচারকের বিবেচনা অনুযায়ী সাধারণ দণ্ডই দেয়া হবে। সাধারণ দণ্ড শরীয়ত নির্ধারণ করেনি। কাল ও পরিবেশ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সাধারণ আইনের অনুরূপ এগুলো পরিবর্তন ও কমবেশী করা যায়। কাজেই এগুলোর ব্যাপারে কারও আপত্তি করার অবকাশ নেই। এখন আলোচ্য বিষয় থেকে যাবে শুধু এ পাঁচটি অপরাধের শাস্তি এবং এগুলোর বিশেষ বিশেষ অবস্থা। উদাহরণতঃ চুরিই ধরুন এবং দেখুন যে, ইসলামে হস্ত কর্তনের শাস্তি সব চুরির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে চুরির কারণে চোরের হাত কাটা হয়, তার একটা বিশেষ সংজ্ঞা আছে। এর ব্যাখ্যা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, অন্যের মাল হেফাযতের জায়গা থেকে বিনানুমতিতে গোপনে নিয়ে যাওয়াকেই সংজ্ঞাদৃষ্টে ও সাধারণ পরিভাষায় চুরি বলা হয়—এরূপ।

আলোচ্য তিনখানি আয়াত এবং তৎপরবর্তী কতিপয় আয়াত যেসব কারণ ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় তার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকেই ইহুদীরা কখনও স্বজন-প্রীতির বশবর্তী হয়ে এবং কখনও নাম-যশ ও অর্থের লোভে ফতোয়া প্রার্থীদের মনমত ফতোয়া তৈরী করে দিত। বিশেষতঃ অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে এটিই ছিল তাদের সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি। কোন বড়লোক অপরাধ করলে তারা তওরাতের গুরুতর শাস্তিকে লঘু শাস্তিতে পরিবর্তন করে দিত। তাদের এ অবস্থাটিই আয়াতের এ বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে—

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْۢ بَعْدِ مَوَاضِعِهٖ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যখন মদীনায় হিজরত

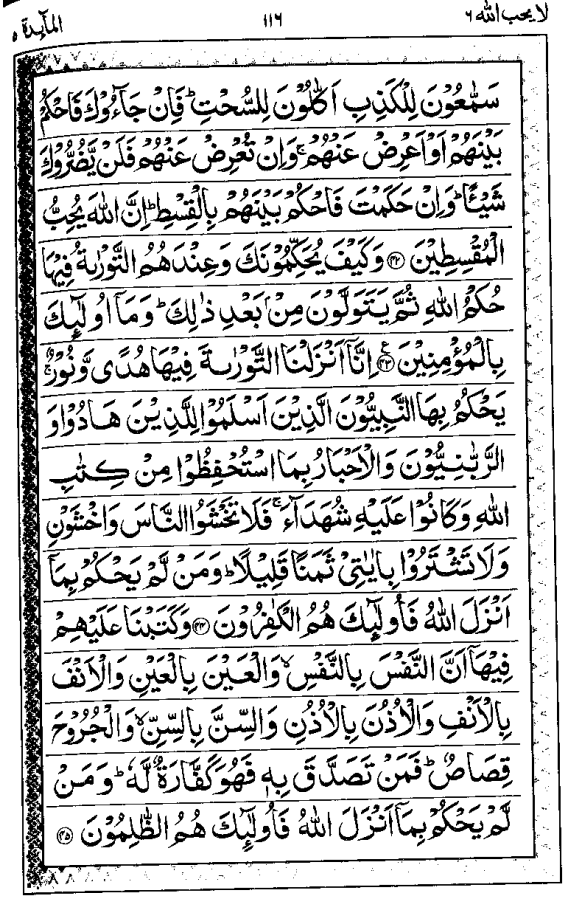

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ
شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا
حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ
بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٣﴾ اِنَّاۤ اَنْزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيْهَا هُدًى وَّنُوْرٌ ۚ
يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لِلَّذِيْنَ هَادُوْا وَ
الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ
اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ
وَلَا تَشْتَرُوْا بِاٰيٰتِيْ ثَمَنًا قَلِيْلًا ؕ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ
اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ
فِيْهَاۤ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ
بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ
قِصَاصٌ ؕ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ؕ وَمَنْ
لَّمْ يَحْكُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

*(৪২) এরা মিথ্যা বলার জন্যে গুপ্তচরবৃত্তি করে, হারাম ভক্ষণ করে। অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন, তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায়ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন। (৪৩) তারা আপনাকে কেমন করে বিচারক নিয়োগ করবে অথচ তাদের কাছে তওরাত রয়েছে। তাতে আল্লাহ্র নির্দেশ আছে। অতঃপর এরা পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা কখনও বিশ্বাসী নয়। (৪৪) আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ পয়গম্বর, দরবেশ ও আলেমরা এর মাধ্যমে ইহুদীদেরকে ফয়সালা দিতেন। কেননা, তাদেরকে এ খোদায়ী গ্রন্থের দেখাশোনা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তাঁরা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না এবং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াতসমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করো না। যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই কাফের। (৪৫) আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময় সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে, সে গোনাহ্ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই জালেম।*

করলেন এবং ইসলামের অভূতপূর্ব জীবন ব্যবস্থা ইহুদীদের সামনে এল, তখন তারা একে একটি সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইল। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় একদিকে যেমন অনেক নমনীয়তা ছিল, অন্যদিকে তেমনি অপরাধ-দমনের জন্যে একটি যুক্তিযুক্ত বিধি-ব্যবস্থাও ছিল। যেসব ইহুদী তওরাতের কঠোর শাস্তিসমূহকে পরিবর্তন করে সহজ করে নিত, তারা এ জাতীয় মোকদ্দমায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বিচারক নিযুক্ত করতে প্রয়াস পেত—যাতে একদিকে ইসলামের সহজ ও নরম বিধি-বিধান দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং অন্যদিকে তওরাত পরিবর্তন করার অপরাধ থেকেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু এ ব্যাপারেও তারা একটি দুষ্কৃতির আশ্রয় নিত। তা এই যে, নিয়মিত বিচারক নিযুক্ত করার পূর্বে কোন না কোন পন্থায় মোকদ্দমার রায় ফতোয়া হিসাবে জেনে নিতে। চাইত উদ্দেশ্য, এ রায় তাদের আকাঙ্খিত রায়ের অনুরূপ হলে বিচারক নিযুক্ত করবে, অন্যথায় নয়। এ সম্পর্কে যেসব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যথেষ্ট মর্মপীড়া অনুভব করেছিলেন। তাই আয়াতের প্রারম্ভেই তাঁকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, এতে আপনি দুঃখিত হবেন না। এর পরিণাম আপনার জন্যে শুভই হবে।

**আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ**

অতঃপর আয়াতে অবহিত করে দেয়া হয়েছে যে, তারা আন্তরিকতার সাথে আপনাকে বিচারক নিযুক্ত করছে না। তাদের নিয়তে গোলমাল রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ক্ষমতা দিয়ে বলা হয়েছে যে, আপনি ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমায় ফয়সালা করুন, নতুবা নির্লিপ্ত থাকুন। আরও বলা হয়েছে যে, আপনি যদি নির্লিপ্ত থাকতে চান, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ আয়াতের বিষয়বস্তু তাই। পরের আয়াতে বলা হয়েছে যদি আপনি ফয়সালাই করতে চান, তবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার সহকারে ফয়সালা করুন। অর্থাৎ, নিজ শরীয়ত অনুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবী হওয়ার পর পূর্ববর্তী সব শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। কোরআনে যেসব আইন বহাল রাখা হয়েছে, সেগুলো অবশ্য রহিত হয়নি। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্র আইনের বিরুদ্ধে অন্য কোন আইন, প্রথা ও প্রচলনের অধীনে মোকাদ্দমার রায় প্রদান করাকে অন্যায়, পাপাচার ও কুফর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

**ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের মোকদ্দমা বিধি ঃ** এখানে স্মর্তব্য যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর আদালতে মোকদ্দমা দায়েরকারী ইহুদীরা, ইসলামে বিশ্বাসী ছিল না এবং মুসলমানদের অধীনস্ত যিম্মীও ছিল না। তবে তারা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) –কে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন এবং ইচ্ছা করলে তাদের মোকদ্দমার শরীয়তানুযায়ী ফয়সালা করুন। কেননা, তাদের ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব ছিল না। তারা যিম্মী হলে এবং ইসলামী আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করলে তার ফয়সালা করা মুসলিম বিচারকের দায়িত্বে ফরয হত; নির্লিপ্ত থাকা জায়েয হত না। কেননা, তাদের অধিকারের দেখাশোনা করা এবং অত্যাচার থেকে রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে মুসলমান ও যিম্মীর মধ্যে কোন তফাৎ নেই; তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ অর্থাৎ, তারা আপনার কাছে মোকদ্দমা নিয়ে আসলে আপনি তার ফয়সালা শরীয়ত

অনুযায়ী করে দিন।

এ আয়াতে ক্ষমতা দেয়ার পরিবর্তে নির্দিষ্ট করে ফয়সালা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। ইমাম আবু বকর জাসসাস আহকামুল কোরআন গ্রন্থে উভয় আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবেই করেছেন যে, যে আয়াতে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, তা ঐসব অমুসলিমের সম্পর্কে, যারা আমাদের রাষ্ট্রের বাসিন্দা অথবা যিম্মী নয়, বরং নিজ দেশে বাস করে আমাদের সাথে কোন চুক্তি করেছে মাত্র। যেমন, বনী-কুরায়যা ও বনী-নুযায়ের। আর দ্বিতীয় আয়াত ঐসব অমুসলিমদের সম্পর্কে, যারা যিম্মী এবং ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক।

এখন প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, উভয় আয়াতে অমুসলিমদের মোকদ্দমায় নিজ শরীয়তানুযায়ী ফয়সালা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের মনোবাঞ্ছার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, এ নির্দেশ ঐসব মোকদ্দমা সম্পর্কেই দেয়া হয়েছে, যা আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নুযূলে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে হত্যার শাস্তি ও রক্ত-বিনিময়ের মোকদ্দমা ও অপরটি হচ্ছে ব্যভিচার সংক্রান্ত মোকদ্দমা। এ জাতীয় মোকদ্দমার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে একই নিয়ম। অর্থাৎ, সমগ্র দেশে একই আইন বলবৎ থাকে। একে সাধারণ আইন বলা হয়। সাধারণ আইনে শ্রেণী অথবা ধর্মের কারণে কোনরূপ পার্থক্য হয় না। উদাহরণতঃ চুরির শাস্তি হস্ত কর্তন শুধু মুসলমানদের বেলায়ই প্রযোজ্য নয়, বরং দেশের যে কোন বাসিন্দার বেলায় এ শাস্তিই প্রযোজ্য। এমনিভাবে হত্যা ও ব্যভিচারের শাস্তিও সবার বেলায় প্রযোজ্য। কিন্তু অমুসলমানদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় ব্যাপারাদির ফয়সালাও যে ইসলামী আইন অনুযায়ী করতে হবে এমনটি জরুরী নয়।

স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদ্যপান ও শূকরের মাংস মুসলমানদের জন্যে হারাম করে তার শাস্তিও নির্ধারিত করেছিলেন, কিন্তু অমুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি অমুসলমানদের বিবাহ-শাদী ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করেননি। তাদের ধর্ম অনুযায়ী যে বিবাহ শুদ্ধ ছিল, তিনি তাই বহাল রেখেছিলেন।

হিজরের অগ্নি পূজারী এবং নাজরান ও ওয়াদিয়ে কুরার ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী ছিল। মহানবী (সাঃ) জানতেন যে, অগ্নি-উপাসকদের ধর্মে মা ও ভগিনীকেও বিয়ে করা হালাল। এমনিভাবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের ধর্মমতে ইদ্দত অতিবাহিত না করে এবং সাক্ষী ব্যতিরেকেও বিবাহ শুদ্ধ। কিন্তু তিনি কখনও তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করেননি, বরং তাদের বিবাহ-শাদীর বৈধতা স্বীকার করে নিয়েছে।

মোটকথা, ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী অমুসলিমদের ব্যক্তিগত ও ধর্মীয় বিষয়াদির মীমাংসা তাদেরই ধর্মমতের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। যদি এ সব ব্যাপারে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে তাদের ধর্মাবলম্বী বিচারক নিযুক্ত করে ফয়সালা করাতে হবে।

তবে যদি তারা মুসলমান বিচারকের নিকট উপস্থিত হয়ে উভয় পক্ষ তাঁর রায় মেনে নিতে সম্মত হয়, তবে মুসলমান বিচারক ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। কেননা, তখন তিনিই উভয় পক্ষে নিযুক্ত বিচারকরূপে গণ্য হবেন। وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-কে ইসলামী আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে দেয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার এক কারণ হয় এই যে, মোকদ্দমাটিই সাধারণ আইনের—যাতে কোন সম্প্রদায়ই আওতা বহির্ভূত নয়, অথবা এর কারণ এই যে, উভয় পক্ষ স্বয়ং রসূলুল্লাহ্‌কে বিচারক স্বীকার করে ফয়সালার জন্যে আসে, এমতাবস্থায় তাঁর ফয়সালা তাই হবে, যার প্রতি তাঁর ঈমান রয়েছে এবং যা তাঁর শরীয়তের নির্দেশ। মোটকথা, আলোচ্য প্রথম আয়াতে প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে অতঃপর ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করা হয়েছে। يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ বাক্য থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত এ বিষয়টিই বর্ণিত হয়েছে।

এতে এ রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) – এর কাছে যে প্রতিনিধি দলটি আগমন করেছিল, তারা সবাই ছিল মুনাফেক। ইহুদীদের সাথে এদের গোপন যোগ-সাজশ রয়েছে এবং এরা তাদেরই প্রেরিত। এরপর প্রতিনিধিদলের কতিপয় বদভ্যাস বর্ণনা করে মুসলমানদের হুশিয়ার করা হয়েছে যে, এগুলো কাফেরসুলভ অভ্যাস। এগুলো থেকে আত্মরক্ষা করা উচিত।

**ইহুদীদের একটি বদভ্যাস ঃ** سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ অর্থাৎ, তারা মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনাতে অভ্যস্ত। তারা আলেম বলে কথিত বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদেরই অন্ধ অনুসারী। তওরাতের নির্দেশাবলীর প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ দেখা সত্ত্বেও তারা তাদেরই অনুসরণ করে এবং তাদের বর্ণিত মিথ্যা ও অমূলক কেচ্ছা-কাহিনীই শুনতে থাকে।

**আলেমদের অনুসরণ করার বিধি ঃ** যারা তওরাত পরিবর্তন করে এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশাবলীতে মিথ্যা বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করে, আয়াতে তাদেরকে লক্ষ্য করে যেমন শাস্তিবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, তেমনি ঐসব লোককেও অপরাধী বলা হয়েছে যারা তাদেরকে অনুসরণযোগ্য সাব্যস্ত করে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এতে মুসলমানদের জন্যেও একটি মৌলিক নির্দেশ রয়েছে যে, আলেমদের কাছ থেকে ফাতোয়া নেয়ার পূর্বে তাদের যোগ্যতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া দরকার। অজ্ঞ জনগণের ধর্ম-কর্ম করার একমাত্র পথ হচ্ছে আলেমদের ফতোয়া ও শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করা। রুগ্ন ব্যক্তি কোন ডাক্তার অথবা হাকীমের কাছে যাওয়ার পূর্বে পরিচিতদের কাছে খোঁজ নেয় যে, এ রোগের জন্যে কোন্ ডাক্তার পারদর্শী, কোন্ হাকীম বেশী ভাল, তার কি কি ডিগ্রী আছে, তার চিকিৎসাধীন রোগীদের পরিণাম কি, যথাসম্ভব খোঁজ-খবর নেয়ার পরও যদি সে কোন ভ্রান্ত ডাক্তার অথবা হাকীমের ফাঁদে পড়ে যায়, তবে বিজ্ঞজনদের দৃষ্টিতে সে নিন্দার পাত্র নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি কোনরূপ খোঁজ-খবর না নিয়েই কোন হাতুড়ে ডাক্তারের ফাঁদে পড়ে এবং পরিণামে অর্থ ও স্বাস্থ্য উভয়ই নষ্ট করে, বিজ্ঞজনদের মতে তার আত্মহত্যার জন্যে সে নিজেই দায়ী হয়।

জনগণের ধর্মকর্মের অবস্থাও তাই। যদি তারা এলাকার বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে খোঁজ-খবর নিয়ে কোন আলেমের অনুসরণ করে এবং তার ফতোয়া অনুযায়ী আমল করে, তবে তারা মানুষের কাছেও ক্ষমাযোগ্য হবে এবং আল্লাহ্র কাছেও। এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, فان اثمه على من افتى – অর্থাৎ, এমতাবস্থায় আলেম ও মুফতী ভুল করলে এবং কোন মুসলমান তার ভুল ফতোয়া অনুযায়ী কাজ করলে, তার গোনাহ্ তার উপর নয়— বরং আলেম ও মুফতীর উপরই বর্তাবে, যদি সে জেনেশুনে ভুল করে কিংবা সম্ভাব্য চিন্তা-ভাবনায় ত্রুটি করে অথবা প্রকৃতপক্ষে সে আলেম না হয়েও যদি জনগণকে ধোঁকা দিয়ে আলেমের পদ দখল করে বসে থাকে।

কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর না নিয়ে শুধু নিজ মতে কোন আলেমের অনুসরণ করে এবং তার উক্তি অনুযায়ী কাজ করে

অথচ সংশ্লিষ্ট আলেম অনুসরণের যোগ্য না হয়, তবে এর গোনাহ্ একা তথাকথিত আলেম ব্যক্তিই বহন করবে না, বরং অনুসরণকারীও সমান অপরাধী হবে। এমন লোকদের সম্পর্কেই কোরআন বলেছে سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ -অর্থাৎ, তারা মিথ্যা কথা শোনায় অত্যন্ত অভ্যস্ত এবং স্বীয় অনুসৃতদের এল্‌ম, আমল ও ধার্মিকতার খোঁজ-খবর না নিয়েই তাদের অনুসরণে লিপ্ত।

কোরআন পাক ইহুদীদের এ অবস্থা বর্ণনা করে মুসলমানদেরকে শুনিয়েছে যেন তারা এ দোষ থেকে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, মুসলমানরা এ ব্যাপারে উদাসীন। এ উদাসীনতাই আজকাল মুসলমানদের চরম দুরবস্থার অন্যতম কারণ। অথচ তারা বৈষয়িক ব্যাপারাদিতে খুবই হুশিয়ার, কর্মচঞ্চল ও সুচতুর। অসুস্থ হলে অধিকতর যোগ্য ডাক্তার-বৈদ্য খোঁজ করে, মোকদ্দমা হলে নামীদামী উকিল-ব্যারিষ্টার নিয়োগ করে এবং গৃহ নির্মাণ করতে হলে উৎকৃষ্টতর স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ারের শরণাপন্ন হয়, কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে এতই উদার যে, কারও দাড়ি-কোর্তা দেখে এবং কিছু কথাবার্তা শুনেই তাকে অনুসরণযোগ্য আলেম, মুফতী ও পথপ্রদর্শক বলে নির্বাচন করে নেয়। সে নিয়মিত কোন মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছে কি না, বিশেষজ্ঞদের সংসর্গে থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেছে কি না, শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কি না, সাচ্চা বুযুর্গ ও আল্লাহ্ ভক্তদের সংসর্গে থেকে কিছু আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করেছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের খবর নেয়ারও প্রয়োজন মনে করে না।

এর ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্ম-কর্মে মনোযোগী, তাদের একটি বিরাট অংশ মূর্খ ওয়ায়েজ ও ব্যবসায়ী পীরের ফাঁদে পড়ে বিশুদ্ধ ধর্মপথ থেকে দূরে পড়ে যায়। তাদের ধর্মীয় জ্ঞান এমন কতিপয় কেচ্ছা-কাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, যা রৈপিক কামনা-বাসনার পরিপন্থী নয়। তারা ধর্মপথে চলছে এবং বিরাট এবাদত করছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কিন্তু কোরআনের ভাষায় তাদের স্বরূপ হচ্ছে এই ঃ

اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا

অর্থাৎ, তারা এমন, যাদের চেষ্টা-চরিত্র ও কাজ-কর্ম পার্থিব জীবনেই লুপ্ত প্রায়, অথচ তারা মনে করছে যে, চমৎকার ধর্ম-কর্ম করে যাচ্ছে।

মোটকথা এই যে, কোরআন পাক سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ বাক্যে মুনাফেক ইহুদীদের অবস্থা বর্ণনা করে একটি বিরাট মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ, মূর্খ জনগণের পক্ষে আলেমদের অনুসরণ করা অপরিহার্য বটে, কিন্তু যথার্থ খোঁজ-খবর না নিয়ে কোন আলেমের অনুসরণ করা ঠিক নয় এবং অজ্ঞ লোকদের মুখে মিছামিছি কথাবার্তা শোনায় অভ্যস্ত হওয়া উচিত নয়।

**ইহুদীদের দ্বিতীয় বদভ্যাস ঃ** উপরোক্ত মুনাফেকদের দ্বিতীয় বদভ্যাস হচ্ছে سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَاْتُوْكَ - অর্থাৎ, এরা বাহ্যত ঃ আপনার কাছে একটি ধর্মীয় বিষয় জিজ্ঞেস করতে এসেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং ধর্মীয় বিষয় জানার জন্যও আসেনি। বরং তারা এমন একটি ইহুদী সম্প্রদায়ের গুপ্তচর, যারা অহংকারবশতঃ নিজে আপনার কাছে আসেনি। তাদের বাসনা অনুযায়ী এরা শুধু ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কে আপনার মতবাদ জেনে তাদেরকে বলে দিতে চায়। এরপর মানা না মানা সম্পর্কে তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। এতে মুসলমানদের জন্যে হুশিয়ারী রয়েছে যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ জানা ও তা অনুসরণ করার নিয়তেই আলেমদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা কর্তব্য। নিজ প্রবৃত্তির অনুকূলে নির্দেশ অনুসন্ধান করার নিয়তে মুফতীদের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করা রিপু ও শয়তানের অনুসরণ বৈ কিছু নয়। এ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

**ইহুদীদের তৃতীয় বদভ্যাস ঐশী গ্রন্থের বিকৃতিসাধন ঃ** ইহুদীরা আল্লাহ্‌র কালামকে যথার্থ পরিবেশ থেকে সরিয়ে তার ভুল অর্থ করত এবং খোদায়ী নির্দেশকে বিকৃত করত। এ বিকৃতি ছিল দ্বিবিধ ঃ তওরাতের ভাষায় কিছু হেরফের করা এবং ভাষা ঠিক রেখে তদস্থলে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা ও পরিবর্তন করা। ইহুদীরা উভয় প্রকার বিকৃতিতেই অভ্যস্ত ছিল।

এতে মুসলমানদের জন্যেও একটি হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। কোরআন পাকের হেফাযতের দায়ীত্ব আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং হাতে রেখেছেন। এতে শাব্দিক পরিবর্তনের দুঃসাহস কেউ করতে পারবে না। কেননা, লিখিত গ্রন্থ ছাড়াও লাখো মানুষের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত কালামে কেউ যের-যবরের পরিবর্তন করতেই ধরা পড়ে যায়। অর্থগত পরিবর্তন বাহ্যতঃ করা যায় এবং কেউ করেছেও। কিন্তু এর হেফাযতের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার গৃহীত ব্যবস্থা এই যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের কিয়ামত পর্যন্ত একটি সত্যপন্থী দল থাকবে, যারা হবে কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বিশুদ্ধ অর্থের বাহক। তারা পরিবর্তনকারীদের রহস্য ফাঁস করে দেবে।

**চতুর্থ বদভ্যাস উৎকোচ গ্রহণ ঃ** দ্বিতীয় আয়াতে তাদের আরও একটি বদভ্যাস বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ - অর্থাৎ, তারা سحت (সুহ্‌ত) খাওয়ায় অভ্যস্ত। সুহ্‌তের শাব্দিক অর্থ কোন বস্তুকে মূলোৎপাটিত করে ধ্বংস করে দেয়া। এ অর্থেই কোরআনে বলা হয়েছে ঃ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ অর্থাৎ, তোমরা কুকর্ম থেকে বিরত না হলে আল্লাহ্ তাআলা আযাব দ্বারা তোমাদের মূলোৎপাটন করে দিবেন। অর্থাৎ, তোমাদের মূল শিকড় ধ্বংস করে দেয়া হবে। আলোচ্য আয়াতে 'সুহ্‌ত' বলে উৎকোচকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ), ইবরাহীম নখয়ী (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), মুজাহিদ (রাঃ), কাতাদাহ্ (রাঃ) ও যাহ্হাক (রাঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

উৎকোচ বা ঘুষকে সুহ্‌ত বলার কারণ এই যে, এটি শুধু গ্রহিতাকেই ধ্বংস করে না, সমগ্র দেশ ও জাতিরও মূলোৎপাটন করে এবং জননিরাপত্তা ধ্বংস করে। যে দেশে অথবা যে বিভাগে ঘুষ চালু হয়ে পড়ে, সেখানে আইনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। অথচ আইনের উপরই দেশ ও জাতির শান্তি নির্ভরশীল। আইন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে কারও জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকে না। তাই ইসলামে একে 'সুহ্‌ত' আখ্যা দিয়ে কঠোরতর হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঘুষের উৎসমুখ বন্ধ করার উদ্দেশে পদস্থ কর্মচারী ও শাসকদেরকে প্রদত্ত উপঢৌকনকেও ছহীহ্ হাদীসে ঘুষ বলে আখ্যায়িত করে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রতিও, যে উভয়ের মধ্যে দালালী বা মধ্যস্থতা করে। - (জাস্‌সাস)

শরীয়তের পরিভাষায় ঘুষের সংজ্ঞা এই যে, যে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা আইনতঃ জায়েয নয় সে কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা। উদাহরণতঃ যে কাজ করা কোন ব্যক্তির কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত, সে

কাজের জন্যে কোন পক্ষ থেকে বিনিময় গ্রহণ করাই ঘুষ। সরকারী অফিসার ও ক্লার্ক চাকরীর অধীনে স্বীয় কর্তব্য –কর্ম সম্পাদন করতে বাধ্য ; সে যদি সংশ্লিষ্ট কোন লোকের কাছ থেকে সে কাজের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করে, তবে তা ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। কন্যাকে পাত্রস্থ করা পিতা–মাতার দায়িত্ব। তারা কারও কাছ থেকে এর বিনিময় গ্রহণ করতে পারে না। এখন কোন পাত্রকে কন্যাদান করে তারা যদি কিছু গ্রহণ করে, তবে তাও ঘুষ। রোযা, নামায, হজ্ব, তেলাওয়াতে-কোরআন ইত্যাদি এবাদতও মুসলমানদের দায়িত্ব। এ জন্যে কারও কাছ থেকে বিনিময় নিলে তা ঘুষ হবে। অবশ্য পরবর্তী ফেকাহ্‌বিদদের ফতোয়া অনুযায়ী কোরআন শিক্ষা দান করা ও নামাযে ইমামতি করা এ থেকে আলাদা।

কেউ যদি ঘুষের বিনিময়ে ন্যায়সংগত কাজও করে দেয়, তবে সে গোনাহ্‌গার হবে এবং ঘুষের অর্থও তার পক্ষে হারাম হবে। পক্ষান্তরে যদি ঘুষ গ্রহণ করে কারও অন্যায় কাজ করে দেয়, সে উপরোক্ত গোনাহ্‌ ছাড়াও অধিকার হরণ এবং খোদায়ী নির্দেশে বিকৃতি সাধনের কঠোর অপরাধে অপরাধী হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ মুসলমানদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ অর্থাৎ, আমি তওরাত গ্রন্থ অবতারণ করেছি, যাতে সত্যের প্রতি পথপ্রদর্শন এবং একটি বিশেষ জ্যোতি ছিল। এ বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আজ যে তওরাতের শরীয়তকে রহিত করা হচ্ছে, এতে করে তওরাতের কোনরূপ মর্যাদাহানি করা হচ্ছে না, বরং সময়ের পরিবর্তনের কারণে বিধি-বিধান পরিবর্তন করার তাগিদেই তা করা হচ্ছে। নতুবা তওরাতও আমারই প্রেরিত গ্রন্থ। এতে বনী-ইসরাঈলের জন্যে পথপ্রদর্শনের মূলনীতি রয়েছে এবং একটি বিশেষ জ্যোতিও রয়েছে, যা আধ্যাত্মিক পন্থায় তাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।

এরপর বলা হয়েছে ঃ

يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ

অর্থাৎ, তওরাত অবতারণের কারণ ছিল এই যে, যত দিন তার শরীয়তকে রহিত করা না হয়, ততদিন পর্যন্ত ভবিষ্যতে আগমনকারী পয়গম্বর, তাঁদের প্রতিনিধি আল্লাহ্‌ ওয়ালা ও আলেমগণ সবাই এ তওরাত অনুযায়ী ফয়সালা করবেন এবং এ আইনকেই জগতে প্রবর্তন করবেন। এ বাক্যে পয়গম্বরদের প্রতিনিধিবর্গকে দুই ভাগে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমভাগ ربانیون এবং দ্বিতীয়ভাগ احبار – ربانی শব্দটি رب এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। এর অর্থ আল্লাহ্‌ ওয়ালা (আল্লাহ্‌ভক্ত)। احبار শব্দটি حبر এর বহুবচন। ইহুদীদের বাকপদ্ধতিতে আলেমকে حبر বলা হত। একথা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌ভক্ত ব্যক্তিমাত্রই আল্লাহ্‌র জরুরী বিধি-বিধান সম্পর্কে অবশ্যই আলেমও হবে। নতুবা এল্‌ম ব্যতীত আমল হতে পারে না এবং আমল ব্যতীত কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌ভক্ত হতে পারে না। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র কাছে সে ব্যক্তিই আলেম, যে এল্‌ম অনুযায়ী আমলও করে। পক্ষান্তরে যে আলেম খোদায়ী বিধান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও জরুরী ফরয ও ওয়াজেবের আমল করে না, তার প্রতি কেউ চোখ তুলেও তাকায় না। সে আল্লাহ্‌ ও রসূলের দৃষ্টিতে মূর্খের চাইতেও অধম। অতএব,



প্রত্যেক আল্লাহ্‌ভক্তই আলেম এবং প্রত্যেক আলেমই আল্লাহ্‌ভক্ত। কিন্তু আলোচ্য বাক্যে আল্লাহ্‌ভক্ত ও আলেমকে পৃথকভাবে উল্লেখ করে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, একটির জন্যে অপরটি জরুরী হলেও যার মধ্যে যে দিক প্রবল, সে অনুযায়ীই তার নাম রাখা হয়। যে ব্যক্তির মনোযোগ বেশীর ভাগ এবাদত, আমল ও যিকিরে নিবদ্ধ থাকে এবং যতটুকু দরকার ততটুকু এল্‌ম হাসিল করে ক্ষান্ত হয় তাকে 'রাব্বানী' অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ভক্ত বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় তাকে শায়খ, মুরশেদ, পীর ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করে জনগণকে শরীয়তের নির্দেশাবলী বর্ণনা করা ও শিক্ষা দেয়ার কাজে বেশীর ভাগ নিয়োজিত থাকে এবং ফরয, ওয়াজেব ও সুন্নতে-মুয়াক্কাদাহ ছাড়া অন্যান্য নফল এবাদতে বেশী সময় ব্যয় করে না তাকে حبر অথবা আলেম বলা হয়।

মোটকথা, এ বাক্যে শরীয়ত ও তরীকত এবং আলেম ও মাশায়েখের আসল একত্বও ব্যক্ত হয়েছে এবং কর্মপন্থা ও প্রধান বৃত্তির দিক দিয়ে তাদের পার্থক্যও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে বুঝা গেল যে, আলেম ও ছুফী দু'টি সম্প্রদায় বা দু'টি দল নয়, বরং উভয়ের জীবনের লক্ষ্যই আল্লাহ্‌ ও রসূলের আনুগত্য। তবে লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাদের কর্মপন্থা বাহ্যতঃ পৃথক বলে মনে হয়।

এরপর এরশাদ হয়েছে ঃ

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ অর্থাৎ, এসব পয়গম্বর ও তাঁদের উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধিবর্গ আলেম ও মাশায়েখ তওরাতের নির্দেশাবলী প্রয়োগ করতে এ কারণে বাধ্য ছিলেন যে, আল্লাহ্‌ তাআলা তওরাতের হেফাযত তাঁদের দায়িত্বেই ন্যস্ত করেছিলেন এবং তাঁরা এ দায়িত্ব পালনের ওয়াদা-অঙ্গীকারও করেছিলেন।

এ পর্যন্ত বর্ণিত হল যে, তওরাত একটি ঐশী গ্রন্থ, পথ প্রদর্শক, জ্যোতি আর আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাম ও তাদের সাচ্চা প্রতিনিধিবর্গ হচ্ছেন মাশায়েখ ও ওলামা এর হেফাযত করেছেন। অতঃপর বর্তমান যুগের ইহুদীদেরকে তাদের বক্রতা ও বক্রতার আসল কারণ সম্পর্কে অবহিত করে বলা হয়েছে ঃ তোমরা পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তওরাতের হেফাযত করার পরিবর্তে এর বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিয়েছ। তওরাতে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে শেষ নবী (সাঃ) - এর আগমনের সংবাদ এবং ইহুদীদেরকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছিল, কিন্তু তারা এ নির্দেশের বিরোধিতা করে এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) - এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পরিবর্তে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে দেয়। আয়াতে তাদের এ মারাত্মক ভ্রান্তির কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ পার্থিব নাম-যশ ও অর্থ লিপ্সাই তোমাদের এ বিরোধিতার কারণ। তোমরা রসূলে করীম (সাঃ)-কে সত্য নবী জেনেও তাঁর অনুসরণ করতে বিব্রত বোধ করছ। কারণ, এখন তোমরা স্বীয় সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় বলে গণ্য হও এবং ইহুদী জনগণ তোমাদের পিছনেই চলে। এমতাবস্থায় ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেলে তোমাদের সর্দারী নষ্ট হয়ে যাবে। এছাড়া বড়লোকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঘুষ নিয়ে তওরাতের নির্দেশ সহজ করে দেয়াকে তারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করার জন্যে বর্তমান যুগের ইহুদীদেরকে বলা হয়েছে ঃ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا অর্থাৎ, তোমরা লোকদেরকে ভয় করো না যে, তারা তোমাদের অনুসরণ ত্যাগ করবে

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن
لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾ وَأَنزَلْنَا
إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ
وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً
وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ
فِي مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا
أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾

*(৪৬) আমি তাদের পেছনে মরিয়ম তনয় ঈসাকে প্রেরণ করেছি। তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নকারী ছিলেন। আমি তাঁকে ইঞ্জীল প্রদান করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। এটি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের, সত্যায়ন করে, পথ প্রদর্শন করে এবং এটি খোদাভীরুদের জন্যে হেদায়েত ও উপদেশবাণী। (৪৭) ইঞ্জীলের অধিকারীদের উচিত, আল্লাহ্ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সলালা করা। যারা আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারাই পাপাচারী। (৪৮) আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যগ্রন্থ, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহের সত্যায়নকারী এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব, আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটি আইন ও পথ দিয়েছি। যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে এক উম্মত করে দিতেন, কিন্তু এরূপ করেননি— যাতে তোমাদেরকে যে ধর্ম দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা নেন। অতএব, দৌড়ে কল্যাণকর বিষয়াদি অর্জন কর। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্র কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। অতঃপর তিনি অবহিত করবেন সে বিষয়, যাতে তোমরা মতবিরোধ করতে। (৪৯) আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন— যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ্ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। অনন্তর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে নিন, আল্লাহ্ তাদেরকে তাদের গোনাহ্র কিছু শাস্তি দিতেই চেয়েছেন। মানুষের মধ্যে অনেকেই নাফরমান। (৫০) তারা কি জাহেলিয়াত আমলের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ্ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্যে উত্তম ফয়সালাকারী কে?*

অথবা শত্রু হয়ে যাবে। তাছাড়া দুনিয়ার নিকৃষ্ট অর্থকড়ি গ্রহণ করে তাদের জন্যে আল্লাহ্র নির্দেশও পরিবর্তন করো না। এতে করে তোমাদের ইহকাল ও পরকাল উভয়টিই বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ প্রেরিত বিধানকে জরুরী মনে করে না এবং তদনুযায়ী ফয়সালা করে না, বরং এর বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা কাফের ও অবিশ্বাসী। এর শাস্তি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব।

এরপর দ্বিতীয় আয়াতে তওরাতের বরাত দিয়ে কেছাছের বিধান বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ
بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ

অর্থাৎ, আমি ইহুদীদের জন্যে তওরাতে এ বিধান অবতারণ করেছিলাম যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং বিশেষ জখমেরও বিনিময় আছে।

বনী-কোরায়যা ও বনী-নুযায়রের একটি মোকদ্দমা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর এজলাসে উত্থাপিত হয়েছিল। বনী-নুযায়র গায়ের জোরে বনী - কোরায়যাকে বাধ্য করে রেখেছিল যে, বনী-নুযায়রের কোন ব্যক্তি যদি তাদের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ নেয়া হবে এবং রক্ত-বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যদি বনী-নুযায়রের কোন ব্যক্তি বনী-কোরায়যার কোন ব্যক্তিকে হত্যা করে, তবে শুধু কেছাছ নয়, রক্ত-বিনিময় দেয়া হবে তাও বনী-নুযায়রের রক্ত-বিনিময়ের অর্ধেক।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা তাদের এ জাহেলিয়াতের মুখোস উম্মোচন করে দিয়েছেন যে, স্বয়ং তওরাতের কেছাছ ও রক্ত-বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমতার বিধান রয়েছে। তারা জেনেশুনে তার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং শুধু বাহানাবাজির জন্যে নিজেদের মোকদ্দমা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) - এর এজলাসে উপস্থিত করে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছেঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ - অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্ প্রেরিত বিধান আনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা জালেম, খোদায়ী বিধানে অবিশ্বাসী এবং বিদ্রোহী। তৃতীয় আয়াতে প্রথমে হযরত ঈসা (সাঃ)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বার্ণিত হয়েছে যে, তিনি পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাতের সত্যায়নের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। এরপর ইঞ্জীল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটিও তওরাতের মতই হেদায়েত ও জ্যোতি।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ

৪৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইঞ্জীলের অধিকারীদের ইঞ্জীলে অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত। যারা এ আইনের বিরুদ্ধে ফয়সালা করে, তারা অবাধ্য ও উদ্ধত।

**কোরআন তওরাত ও ইঞ্জীলের সংরক্ষকঃ** পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছেঃ ''আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতারণ করেছি, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জীলের সত্যায়ন

করে এবং এদের সংরক্ষকও বটে''। কারণ, যখন তওরাতের অধিকারীরা তওরাতে এবং ইঞ্জীলের অধিকারীরা ইঞ্জীলে পরিবর্তন সাধন করে, তখন কোরআনই তাদের পবির্তনের মুখোস উম্মোচন করে সংরক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তওরাত ও ইঞ্জীলের প্রকৃত শিক্ষা আজও কোরআনের মাধ্যমেই পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। অথচ এসব গ্রন্থের উত্তরাধিকারী এবং অনুসরণের দাবীদাররা এদের রূপ এমনভাবে বিগড়িয়ে দিয়েছে যে, সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। শেষাংশে মহানবী (সাঃ)-কে তওরাত ও ইঞ্জীলধারীদের অনুরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে ঃ আপনার যাবতীয় নির্দেশ ও ফয়সালা আল্লাহ্ প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী হতে হবে। যারা আপনার দ্বারা স্বীয় বৈষয়িক কামনা-বাসনা অনুযায়ী ফয়সালা করাতে চায়, তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হুশিয়ার থাকবেন। এরূপ বলার একটি বিশেষ কারণ ছিল এই যে, ইহুদীদের কতিপয় আলেম মহানবী (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, আপনি জানতেন, আমরা ইহুদীদের আলেম ও ধর্মীয় নেতা। আমরা মুসলমান হয়ে গেলে তারাও সবাই মুসলমান হয়ে যাবে। তবে আমাদের একটি শর্ত আছে। তা হল এই যে, আপনার কওমের সাথে আমাদের একটি মোকদ্দমা রয়েছে আমরা মোকদ্দমাটি আপনার কাছে উত্থাপন করব। আপনি এর ফয়সালা আমাদের পক্ষে করে দিলে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। আল্লাহ্ তাআলা হুযুর (সাঃ)-কে এ বিষয়ে সতর্ক করে বলছেন ঃ আপনি এদের মুসলমান হওয়ার প্রেক্ষিতে ন্যায়, সুবিচার ও আল্লাহ্ প্রেরিত আইনের বিপক্ষে কোন ফয়সালা দিবেন না এবং এরা মুসলমান হবে কি হবে না এ বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবেন না।

**পয়গম্বরদের বিভিন্ন শরীয়তের আংশিক প্রভেদ ও তার তাৎপর্য** ঃ আলোচ্য আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রশ্নটি এই যে, সব আম্বিয়া আলাইহিমুসসালাম যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই প্রেরিত এবং তাঁদের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থ, ছহীফা ও শরীয়তসমূহও যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আগত, তখন এসব গ্রন্থ ও শরীয়তের মধ্যে প্রভেদ কেন এবং পরবর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তকে রহিত করে দেয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তর ও তাৎপর্য এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً

وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ

অর্থাৎ, আমি তোমাদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যে একটি বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি। এতে মূলনীতি অভিন্ন ও সর্বসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শাখাগত নির্দেশসমূহে কিছু প্রভেদ আছে। যদি আল্লাহ্ তোমাদের সবাইকে একই উম্মত, একই জাতি এবং সবার জন্যে একই গ্রন্থ ও একই শরীয়ত নির্ধারণ করতে চাইতেন, তবে এরূপ করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু আল্লাহ্ তা পছন্দ করেননি। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পরীক্ষা করা। তিনি যাচাই করতে চান যে, কারা এবাদতের স্বরূপ অবগত হয়ে নির্দেশ এলেই তা পালন করার জন্যে সর্বদা কান পেতে রাখে, নতুন গ্রন্থ ও নতুন শরীয়ত এলে তার অনুসরণে লেগে যায়, পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়ত প্রিয় হলেও এবং পৈতৃক ধর্ম হয়ে যাওয়ার কারণে তা বর্জন করা কঠিন হলেও কারা সর্বদা উন্মুখভাবে আনুগত্যের জন্যে প্রস্তুত থাকে। পক্ষান্তরে কারা এ সত্য বিস্মৃত হয়ে বিশেষ শরীয়ত ও বিশেষ গ্রন্থকেই সম্বল করে নেয় এবং পৈতৃক ধর্ম হিসেবে আঁকড়ে থাকে— এর বিপক্ষে খোদায়ী নির্দেশের প্রতিও কর্ণপাত করে না।

শরীয়তসমূহের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে এটি একটি বিরাট রহস্য। এর মাধ্যমে প্রত্যেক যুগের ও প্রত্যেক স্তরের মানুষকে এবাদত ও দাসত্বের এ স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করা হয় যে, প্রকৃতপক্ষে দাসত্ব, আনুগত্য ও অনুসরণকেই এবাদত বলা হয়। এ দাসত্ব ও আনুগত্য নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, যিকর ও তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে এগুলো উদ্দেশ্যও নয়, বরং এগুলোর লক্ষ্য হচ্ছে খোদায়ী নির্দেশের আনুগত্য। একারণেই যে সময়ে নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সে সময়ে নামায পড়লে ছোয়াব তো দূরের কথা, উল্টো পাপের বোঝাই ভারী হয়। দুই ঈদসহ বছরে পাঁচদিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ। এসময়ে রোযা রাখা নিশ্চিত গোনাহ্। ৯ই যিলহজ্ব ছাড়া অন্য কোনদিন কোন মাসে আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হয়ে দোয়া ও এবাদত করা বিশেষভাবে কোন ছোয়াবের কাজ নয়। অথচ ৯ই যিলহজ্ব তারিখে এটি সর্ববৃহৎ এবাদত। অন্যান্য এবাদতের অবস্থাও তাই। যতক্ষণ তা করার নির্দেশ, ততক্ষণই তা এবাদত এবং যখন যেখানে নিষেধ করা হয়, তখন সেখানে তা হারাম ও না জায়েয হয়ে যায়। অজ্ঞ জনসাধারণ এ সত্য সম্পর্কে অবহিত নয়। যেসব এবাদত তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, বরং যেসব জাতীয় প্রথাকে তারা এবাদত মনে করে পালন করতে থাকে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রকাশ্য নির্দেশের প্রতিও তারা কর্ণপাত করে না। এ ছিদ্রপথেই বেদআত ও মনগড়া আচার-অনুষ্ঠান ধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থ ও শরীয়তে পরিবর্তন হওয়ার কারণও ছিল তাই। আল্লাহ্ তাআলা বিভিন্ন পয়গম্বরের প্রতি বিভিন্ন গ্রন্থ ও শরীয়ত অবতারণ করে মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোন একটি কাজ অথবা এক প্রকার এবাদতকে উদ্দেশ্য করে নেয়া ঠিক নয়, বরং বিশুদ্ধ অর্থে আল্লাহ্র অনুগত বান্দা হওয়া উচিত। আল্লাহ্ যখনই আগের কাজ বর্জন করার আদেশ দেন, তখনই তা বর্জন করা দরকার এবং যে কাজের নির্দেশ দেন, বিনা দ্বিধায় তা পালন করা কর্তব্য।

এ ছাড়া শরীয়তসমূহের বিভিন্নতার আর একটি বড় রহস্য এই যে, জগতের প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক স্তরের মানুষের মনমেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতি বিভিন্ন। কালের পরিবর্তন মানবস্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যদি সবার জন্যে শাখাগত বিধান এক করে দেয়া হয়, তবে মানুষ গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই খোদায়ী রহস্যের তাগিদে প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক মানুষের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে শাখাগত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। এখানে 'নাসিখ' (রদকারী আদেশ) ও 'মনসূখ' (রদকৃত আদেশ)-এর অর্থ এরূপ নয় যে, আদেশদাতা পূর্বের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না বলে একটি আদেশ জারি করার ফলে যখন নতুন পরিস্থিতি সামনে এল, তখন অপর একটি আদেশ জারি করে একে রহিত করে দিলেন, অথবা পূর্বে অসাবধানতা ও ভ্রান্তিবশতঃ কোন নির্দেশ জারি করেছিলেন, পরে হুশিয়ার হয়ে তা পরিবর্তন করে দিলেন। বরং শরীয়তসমূহে নাসিখ ও মনসূখের অবস্থা একজন বিজ্ঞ হাকীম ও ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রের মত। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্রে পর্যায়ক্রমে ঔষধ পরিবর্তন করে। তিনি পূর্ব থেকেই জানেন যে, তিন দিন এ ওষুধ প্রয়োগ করার পর রোগীর মধ্যে এরূপ অবস্থা দেখা দেবে, তখন অমুক ওষুধ সেবন করানো হবে। সুতরাং ডাক্তার যখন পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপত্র রহিত করে নতুন ব্যবস্থাপত্র দেন তখন এরূপ বলা ঠিক নয় যে, পূর্বের ব্যবস্থাপত্রটি ভুল ছিল বলেই রহিত করা হয়েছে। বরং আসল সত্য হচ্ছে এই যে, বিগত দিনগুলোতে সে ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরী ছিল এবং পরবর্তী পরিবর্তিত অবস্থায় পরবর্তী পরিবর্তিত এ ব্যবস্থাপত্রই নির্ভুল ও জরুরী।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ
تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ۚ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ
فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ
آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ۙ إِنَّهُمْ
لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ
يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكَ
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾

*(৫১) হে মুমিনগণ, তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৫২) বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে ঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন— ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে। (৫৩) মুসলমানরা বলবে ঃ এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহ্র নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। (৫৪) হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ— তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। (৫৫) তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ্, তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ— যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। (৫৬) আর যারা আল্লাহ্ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহ্র দল এবং তারাই বিজয়ী।*

**আলোচ্য আয়তসমূহে বর্ণিত স্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক বিধানসমূহের সারসংক্ষেপ** ঃ (১) প্রাথমিক আয়াতসমূহের দ্বারা জানা যায় যে, ইহুদীদের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় মহানবী (সাঃ) যে ফয়সালা দিয়েছিলেন, তা তওরাতের শরীয়তানুযায়ী ছিল। এতে প্রমাণিত হয় যে, বিগত শরীয়তসমূহের বিধি-বিধানকে যদি কোরআন অথবা ওহী রহিত না করে, তবে তা যথারীতি বহাল থাকে। যেমন ইহুদীদের মোকদ্দমায় কেছাছের সমতা এবং ব্যভিচারের শাস্তিতে প্রস্তর বর্ষণে হত্যার নির্দেশ তওরাতে ছিল এবং অতঃপর কোরআনও তা হুবহু বহাল রেখেছে।

(২) দ্বিতীয় আয়াতে জখমের কেছাছ সম্পর্কিত বিধান তওরাতের বরাত দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামেও এ বিধান রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জারি করেছেন। এ কারণেই আলেমদের মতে বিগত শরিয়তসমূহের যেসব বিধান কোরআন রহিত করেনি, সেগুলো আমাদের শরীয়তেও প্রযোজ্য এবং অনুসরণীয়। এর ভিত্তিতেই আলোচ্য আয়াতসমূহে তওরাতের অনুসারীদেরকে তওরাত অনুযায়ী এবং ইঞ্জীলের অনুসারীদেরকে ইঞ্জীল অনুযায়ী ফয়সালা দেয়ার ও আমল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথচ এ গ্রন্থদ্বয় ও তার শরীয়ত মহানবী (সাঃ)-এর আগমনের সাথে সাথেই রহিত হয়ে গেছে। উদ্দেশ এই যে, তওরাত ও ইঞ্জীলের যেসব বিধান কোরআন রহিত করেনি, সেগুলোর আজও অনুসরণ করা জরুরী।

(৩) আল্লাহ্ প্রেরিত বিধি-বিধান সত্য নয়— এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এসব বিধানের বিরুদ্ধে ফয়সালা করা কুফর, কিন্তু সত্য বিশ্বাস করার পর যদি কার্যতঃ বিপরীত করা হয়, তবে তা অন্যায় ও পাপ।

(৪) ঘুষ গ্রহণ করা সর্বাবস্থায় হারাম— বিশেষতঃ আইন বিভাগে ঘুষ গ্রহণ করা অধিকতর হারাম।

(৫) আলোচ্য আয়াত থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সব পয়গম্বর ও তাঁদের শরীয়ত মূলনীতির ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন, কিন্তু তাদের আংশিক ও শাখাগত বিধি-বিধান বিভিন্ন এবং এ বিভিন্নতা বিরাট রহস্যের উপর নির্ভরশীল।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সামঞ্জস্য ও গভীর বন্ধুত্ব না করে। সাধারণ অমুসলিম এবং ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের রীতিও তাই। তারা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক শুধু স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে; মুসলমানদের সাথে এরূপ সম্পর্ক স্থাপন করে না।

এরপর যদি কোন মুসলমান এ নির্দেশ অমান্য করে কোন ইহুদী অথবা খ্রীষ্টানের সাথে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে, তবে সে ইসলামের দৃষ্টিতে সে সম্প্রদায়েরই লোক বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ইকরিমা (রাঃ)-এর বাচনিক বর্ণনা করেন ঃ এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় আগমনের পর পার্শ্ববর্তী ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে এই মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেরা যুদ্ধ করবে না, বরং মুসলমানদের সাথে কাঁধ মিলিয়ে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। এমনিভাবে মুসলমানরাও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না এবং কোন বহিরাক্রমণকারীর সাহায্য করবে না, বরং আক্রমণকারীকে প্রতিহত করবে। কিছুদিন পর্যন্ত এ চুক্তি উভয় পক্ষেই বলবৎ থাকে, কিন্তু ইহুদীরা স্বভাবগত কুটিলতা ও ইসলাম

বিদ্বেষের কারণে বেশীদিন এ চুক্তি মেনে চলতে পারল না এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরেকদের সাথে ষড়যন্ত্র করে তাদেরকে স্বীয় দুর্গে আহবান জানিয়ে পত্র লিখল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তাদের বিরুদ্ধে একটি মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করলেন। বনী-কুরায়যার এসব ইহুদী একদিকে মুশরকেদের সাথে হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অপরদিকে মুসলমানদের দলে অনুপ্রবেশ করে অনেক মুসলমানের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। এভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরেকেদের জন্যে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত ছিল। এ কারণে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং মুসলমানদেরকে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করে দেয়া হয়, যাতে শত্রুরা মুসলমানদের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করতে না পারে। তখন ওবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী প্রকাশ্যভাবে তাদের সাথে চুক্তি বিলোপ ও অসহযোগের কথা ঘোষণা করেন। অপর পক্ষে কিছুসংখ্যক লোক, যারা কপট বিশ্বাসের অধীনে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কিংবা যারা তখনও ঈমানের দিক দিয়ে দুর্বল ছিল, তারা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার মধ্যে সমূহ বিপদাশঙ্কা অনুভব করত। তারা চিন্তা করত, যদি মুশরেক ও ইহুদীদের চক্রান্ত সফল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়, তবে আমাদের প্রাণ রক্ষার একটা উপায় থাকা দরকার। কাজেই এদের সাথেও সম্পর্ক রাখা উচিত, যাতে তখন আমরা বিপদে না পড়ি। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সলুল একারণেই বলল ঃ এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আমার মতে বিপজ্জনক। তাই আমি তা করতে পারি না। এর পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আয়াতটি অবতীর্ণ হল ঃ

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ
نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ

অর্থাৎ, অসহযোগের নির্দেশ শুনে যাদের অন্তরে কপটতাজনিত রোগ ছিল, তারা কাফের বন্ধুদের পানে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল এবং বলতে লাগল ঃ এদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের মধ্যে আমাদের জন্য বিপদাশঙ্কা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এর উত্তরে বলেন ঃ

فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَّأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوا عَلَى
مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نٰدِمِينَ

অর্থাৎ, এরা তো এ কল্পনাবিলাসে মত্ত যে, মুশরেক ও ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার সিদ্ধান্ত এই যে, এরূপ হবে না, বরং মক্কা বিজয় অতি সন্নিকটে অথবা মক্কা বিজয়ের পূর্বেই আল্লাহ তাআলা মুনাফেকদের মুখোস উন্মোচন করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। তখন তারা মনের লুক্কায়িত চিন্তাধারার জন্যে অনুতপ্ত হবে।

তৃতীয় আয়াতে এ বিষয়টি আরও পরিস্কার করে বলা হয়েছে যে, যখন মুনাফেকদের মুখোস উন্মোচিত হবে এবং তাদের বন্ধুত্বের দাবী ও শপথের স্বরূপ ফুটে উঠবে, তখন মুসলমানরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে বলবে ঃ এরাই কি আমাদের সাথে আল্লাহ্র নামে কঠোর শপথ করে বন্ধুত্বের দাবী করত ? আজ এদের সব লোক দেখানো ধর্মীয় কার্যকলাপই বিনষ্ট হয়ে গেছে! আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা মক্কা বিজয় ও মুনাফেকদের লাঞ্ছনার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার বাস্তব চিত্র কিছুদিন পর সবাই প্রত্যক্ষ করেছিল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিমদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব ও মেলামেশা করতে নিষেধ করা হয়েছে। নতুবা সত্যধর্ম ইসলামের হেফাযতের দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজেই গ্রহণ করেছেন। কোন ব্যক্তি কিংবা দলের বক্রতা ও অবাধ্যতা দূরের কথা, স্বয়ং মুসলমানদের কোন ব্যক্তি কিংবা দল যদি সত্যি সত্যি ইসলাম ত্যাগ করে বসে এবং সম্পূর্ণ ধর্মত্যাগী হয়ে অমুসলিমদের সাথে হাত মিলায়, তবে এতেও ইসলামের কোনই ক্ষতি হবে না— হতে পারে না। কারণ, এর হেফাযতের দায়িত্ব সর্বশক্তিমানের। তিনি তৎক্ষণাৎ অন্য কোন জাতিকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন, যারা ইসলামের হেফাযত ও প্রচারের কর্তব্য সম্পাদন করবে। আল্লাহ্ তাআলার কাজ কোন ব্যক্তি, বিরাট দল অথবা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল নয়। তিনি যখন চান খড়-কুটাকেও কড়িকাঠের কাজে লাগাতে পারেন। অন্যথায় কড়ি-কাঠও পচে-গলে মাটি হতে থাকে।

এ আয়াতে যেখানে একথা বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা ধর্মত্যাগী হয়ে গেলে আল্লাহ্ তাআলা কোন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন, সেখানে সেই পুণ্যাত্মা জাতির কিছু গুণাবলীও বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে, এ গুণগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, এসব গুণের অধিকারীরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে প্রিয় ও মকবুল।

তাদের প্রথম গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ভালবাসবেন এবং তারা নিজেরাও আল্লাহ্ তাআলাকে ভালবাসবে। এ গুণটি দুই অংশে বিভক্ত ঃ (এক) আল্লাহ্র সাথে তাদের ভালবাসা। একে কোন না কোন স্তরে মানুষের ইচ্ছাধীন মনে করা যায়। কারও সাথে কারও স্বভাবজাত ভালবাসা না হলেও কমপক্ষে যৌক্তিক ভালবাসাকে স্বীয় ইচ্ছাধীন রাখতে পারে। এছাড়া স্বভাবজাত ভালবাসা যদিও ইচ্ছাধীন নয়, কিন্তু এর উপায়-উপকরণগুলো ইচ্ছাধীন। উদাহরণতঃ আল্লাহ্ তাআলার মাহাত্ম্য, প্রতাপ, শক্তি-সামর্থ্য এবং মানুষের প্রতি তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অগণিত নেয়ামতরাজির ধ্যান ও কল্পনা অবশ্যম্ভাবীরূপে মানুষের মনে আল্লাহ্র প্রতি স্বভাবজাত ভালবাসা সৃষ্টি করে দেয়।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ, তাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসার ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ মানুষের ইচ্ছা ও কর্মের কোন ভূমিকা নেই। যে বিষয়টি মানুষের ইচ্ছা ও সামর্থ্যের বাইরে, তা মানুষকে শুনানোরও কোন বাহ্যিক সার্থকতা নেই।

কিন্তু কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াতের পর্যালোচনা করলে বুঝা যায় যে, এ ভালবাসার উপায়-উপকরণগুলোও মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি এসব উপায়কে কাজে লাগায়, তবে তাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা অবশ্যম্ভাবী। এসব উপায় নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

অর্থাৎ, হে রসূল, আপনি বলে দিন ঃ যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তবে আমাকে অনুসরণ কর। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে ভালবাসতে থাকবেন।

এ আয়াত থেকে জানা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা লাভ করতে চায়, তার উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পদক্ষেপে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর সুন্নত অনুসরণে অবিচল থাকা।

এমন করলে আল্লাহ তাআলা তাকে ভালবাসবেন বলে ওয়াদা দিয়েছেন। এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, যে দল সুন্নতের অনুসরণ করে, শরীয়তের নির্দেশ পালনে ত্রুটি করে না এবং নিজেরা সুন্নত বিরোধী কাজ-কর্ম ও বেদআত প্রচার করে না, একমাত্র তারাই কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করতে সক্ষম।

'তারা মুসলমানদের সামনে নম্র হবে এবং কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হলে সত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও সহজে বশ হয়ে তারা ঝগড়া ত্যাগ করবে। এ অর্থেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

انا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق

অর্থাৎ, আমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতের মধ্যস্থলে বাসস্থান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করছি, যে সত্যপন্থী হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া ত্যাগ করে।

মোটকথা, তারা মুসলমানদের সাথে স্বীয় অধিকার ও কাজ-কারবারের ব্যাপারে কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদ রাখবে না। বাক্যের দ্বিতীয় অংশে اعزة শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি عزيز এর বহুবচন। এর অর্থ প্রবল, শক্তিশালী ও কঠোর। উদ্দেশ্য এই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর ধর্মের শত্রুদের মোকাবিলায় কঠোর ও পরাক্রান্ত। শত্রুরা তাদেরকে সহজে কাবু করতে পারে না।

উভয় বাক্য একত্রিত করলে সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, তারা হবে এমন একটি জাতি, যাদের ভালবাসা ও শত্রুতা নিজ সত্ত্বা ও সত্ত্বাগত অধিকারের পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও ধর্মের খাতিরে নিবেদিত প্রাণ হবে। এ কারণেই তাদের বন্দুকের নল আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগতদের দিকে নয়; বরং তাঁর শত্রু ও অবাধ্যদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে। সূরা ফাত্হে উল্লেখিত أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ আয়াতের বিষয়বস্তুও তাই।

প্রথম গুণের সারমর্ম ছিল অধিকারসমূহে পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় গুণের সারমর্ম ছিল বান্দার অধিকার ও কাজ-কারবারের সমতা। তাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ – অর্থাৎ, তারা সত্যধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জেহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করার জন্যে শুধু কতিপয় প্রচলিত এবাদত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্যে চতুর্থ গুণ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারই পরওয়া করবে না।

চিন্তা করলে বুঝা যাবে, যে কোন আন্দোলন পরিচালনার পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হয়ে থাকে। প্রথমতঃ বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়তঃ আপন লোকদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ়সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না- জেল-জুলুম, জখম, হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অম্লানবদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মবীরদেরও পদস্খলন ঘটে। সম্ভবত ঃ একারণেই আল্লাহ তাআলা এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশে বলেছেন যে, তারা কারও ভর্ৎসনার পরওয়া না করে স্বীয় জেহাদ অব্যহত রাখবে।

আয়াতের শেষাংশে এ কথাও বলা হয়েছে যে, এসব গুণ ও উত্তম অভ্যাসসমূহ আল্লাহ তাআলারই দান। তিনিই যাকে ইচ্ছা এসব গুণ দ্বারা ভূষিত করেন। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছাড়া মানুষ শুধু চেষ্টাচরিত্রের মাধ্যমে এগুলো অর্জন করতে পারে না।

আয়াতের শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করলে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে কিছু লোক ধর্মত্যাগী হয়ে গেলেও ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না, বরং ইসলামের হেফাযত ও সমর্থনের জন্যে আল্লাহ তাআলা একটি উচ্চস্তরের চরিত্র ও আমলের অধিকারী দলকে কর্মক্ষেত্রে অবতারণ করবেন।

তফসীরবিদগণ বলেছেন ঃ এ আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে অনাগত গোলযোগকে প্রতিহতকারী দলের জন্যে একটি সুসংবাদ। অনাগত গোলযোগ হচ্ছে ধর্মত্যাগের সে হিড়িক, যার কিছু কিছু জীবাণু নবুওতের সর্বশেষ দিনগুলোতে পাখা বিস্তার করতে শুরু করেছিল এবং অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর ওফাতের পর তা ঘূর্ণির আকারে সমগ্র আরব উপত্যকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। পক্ষান্তরে সুসংবাদ লাভের অধিকারী হচ্ছে ছাহাবায়ে কেরামের সে দল, যারা প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) – এর ডাকে বজ্রকঠোর দৃঢ়তার সাথে ধর্মত্যাগের এ হিড়িককে স্তব্ধ করে দেন।

ঘটনাগুলো ছিল এই ঃ সর্বপ্রথম মুসায়লামা কাযযাব মহানবী (সাঃ) – এর সাথে নবুওয়তে অংশিদারিত্বের দাবী করে। তার ধৃষ্টতা এত চরমে পৌছে যে, সে মহানবী (সাঃ) – এর দূতকে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। সে দূতদেরকে হুমকি দিয়ে বলে ঃ যদি দূতদেরকে হত্যা করা আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী না হত, তবে আমি তোমাদেরকে হত্যা করতাম। মুসায়লামা স্বীয় দাবীতে মিথ্যাবাদী ছিল। হুযুর (সাঃ) তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

এমনিভাবে এয়ামনে মুয্জাজ্ গোত্রের সর্দার আসওয়াদ আ'নাসী নবুওয়তের দাবী করে বসে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে দমন করার জন্যে এয়ামনে নিযুক্ত গভর্নরকে নির্দেশ দেন। কিন্তু যে রাত্রে তাকে হত্যা করা হয়, তার আগের দিন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ওফাত পান। রবিউল আউয়াল মাসের শেষ দিকে ছাহাবায়ে কেরামের কাছে এ সংবাদ পৌছে। বনী-আসাদ গোত্রেও এমনি ধরনের আরেক ঘটনা ঘটে। তাদের সর্দার তোলায়হা ইবনে খুওয়াইলেদ নবুওয়ত দাবী করে বসে।

উপরোক্ত তিনটি গোত্র হুযুরে আকরম (সাঃ) – এর রোগ শয্যায় থাকা অবস্থায়ই ধর্মত্যাগী হয়ে যায়। অতঃপর তাঁর ওফাতের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সাথে সাথে সর্বত্র ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। আরবের সাতটি গোত্র বিভিন্ন স্থানে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য বর্জন করে। তারা প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর সিদ্দীককে ইসলামী আইন অনুযায়ী যাকাত প্রদান করতে অস্বীকার করে।

হুযুর (সাঃ)-এর ওফাতের পর দেশ ও জাতির দায়িত্ব প্রথম খলিফা হযরত আবুবকর (রাঃ) এর কাঁধে অর্পিত হয়। একদিকে তাঁরা ছিলেন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এর বিয়োগ ব্যথায় মুহ্যমান; অপরদিকে ছিল গোলযোগ ও বিদ্রোহের হিড়িক। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ্র ওফাতের পর আমার পিতা হযরত আবুবকরের উপর যে বিপদের বোঝা পতিত হয়, তা কোন পাহাড়ের উপর পতিত হলে পাহাড়ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন দুর্জয় শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা দান করেন যে, তিনি অমিত বিক্রমে সমস্ত আপদ-বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যান এবং সর্বশেষে সফলকাম হন।

এটা জানা কথা যে, শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও বিদ্রোহের মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু তখনকার পরিস্থিতি এতই নাজুক ছিল যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) ছাহাবায়ে-কেরামের কাছে পরামর্শ চাইলে কেউ সে পরিস্থিতিতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে মত দিলেন না। ছাহাবায়ে-কেরাম অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়লে বহিঃশক্তি এ নবীন ইসলামী দেশটির উপর চড়াও হয়ে পড়তে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় সিদ্দীকের অন্তরকে এ জেহাদের জন্যে পাথরের মত মজবুত করে দিলেন। তিনি ছাহাবায়ে-কেরামের সামনে এমন এক মর্মভেদী ভাষণ দিলেন, যার ফলে এ জেহাদের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কারও মনে কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট রইল না। তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় স্বীয় দৃঢ়তা ও অসম সাহসিকতা সবার সামনে তুলে ধরেনঃ

"যারা মুসলমান হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত নির্দেশ ও ইসলামী আইনকে অস্বীকার করে, তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা আমার কর্তব্য। যদি আমার বিপক্ষে সব জিন-মানব ও বিশ্বের যাবতীয় বৃক্ষ-প্রস্তর একত্রিত করে আনা হয় এবং আমার সাথে কেউ না থাকে, তবুও আমি একা এ জেহাদ চালিয়ে যাব।"

একথা বলে তিনি ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তখন ছাহাবায়ে কেরাম সামনে এগিয়ে এলেন এবং তাঁকে এক জায়গায় বসিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিভিন্ন বাহিনী প্রেরণের জন্য মানচিত্র তৈরী করে ফেললেন।

একারণেই হযরত আলী মুর্তজা (রাঃ), হাসান বসরী (রহঃ), যাহ্হাক (রহঃ) প্রমুখ তফসীরবিদগণ বর্ণনা করেন যে, এ আয়াতটি হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) ও তাঁর সহকর্মীদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতে যে জাতিকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে আনার কথা বর্ণিত হয়েছে, তাঁরাই হলেন সর্বপ্রথম সে জাতি।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অন্য কোন দল আয়াতে কথিত জাতি হবে না; বরং অন্যদের বেলায়ও এ আয়াতটি প্রযোজ্য হতে পারে। যারা হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) ও অন্যান্য ছাহাবায়ে-কেরামকে আয়াতের প্রতীক বলে আখ্যা দিয়েছেন, তাঁরাও এর বিরোধী নন। বরং নির্ভুল বক্তব্য এই যে, তাঁরা সবাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী যেসব মুসলমান কোরআনী নির্দেশ অনুযায়ী কুফর ও ধর্মত্যাগের মুকাবিলা করবে, তাঁরাও এ আয়াতের লক্ষণভুক্ত। মোটকথা, ছাহাবায়ে-কেরামের একটি দল খলিফার নির্দেশে এ গোলযোগ দমনে তৈরী হয়ে গেলেন। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) – কে একটি বিরাট বাহিনীসহ মুসায়লামাকে দমন করার উদ্দেশে এয়ামামার দিকে প্রেরণ করা হল। সেখানে মুসায়লামার দল যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে নিয়েছিল। তুমুল যুদ্ধের পর মুসায়লামা হযরত ওয়াহ্শী (রাঃ) – এর হাতে নিহত হল এবং তার দল তওবা করে পুনরায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এমনিভাবে তোলায়হা ইবনে খুওয়াইলেদের মুকাবিলায়ও হযরত খালেদই (রাঃ) গমন করলেন। তোলায়হা পলায়ন করে দেশের বাইরে চলে যায়। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে পুনরায় ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য দান করেন এবং সে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে।

সিদ্দীকী খেলাফতের প্রথম মাসে রবিউল আউয়ালের শেষ দিকে আসওয়াদ আনাছীর হত্যা ও তার গোত্রের বশ্যতা স্বীকারের সংবাদ মদীনায় পৌছে। এটিই ছিল সর্বপ্রথম বিজয়বার্তা, যা চরম সঙ্কট মুহূর্তে খলিফা লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে অন্যান্য যাকাত অস্বীকারকারীদের মুকাবিলায় আল্লাহ তাআলা প্রতিটি রণাঙ্গনে ছাহাবায়ে-কেরামকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেন।

এভাবে তৃতীয় আয়াতের শেষভাগে উল্লেখিত فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (নিশ্চয় আল্লাহভক্তদের দলই বিজয়ী)। আল্লাহ তাআলার এ উক্তির বাস্তব ব্যাখ্যা পৃথিবীবাসী স্বচক্ষে দেখতে পায়। ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে যখন একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মহানবী (সাঃ)– এর ওফাতের পর আরবে ধর্মত্যাগের হিড়িক পড়ে যায় এবং এর মুকাবিলার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা যে জাতিকে কর্মক্ষেত্রে আনয়ন করেন, তাঁরা হলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) ও তাঁর সহকর্মী সাহাবায়ে কেরাম, তখন এ আয়াত থেকেই একথাও প্রমাণিত হয় যে, এ দলের যেসব গুণ কোরআন পাক বর্ণনা করেছে, তা সবই হযরত আবুবকর (রাঃ) ও তাঁর সহকর্মী ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ, –

প্রথমতঃ আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে ভালবাসেন।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসেন।

তৃতীয়তঃ তাঁরা সবাই মুসলমানদের ব্যাপারে নম্র এবং কাফেরদের বেলায় কঠোর।

চতুর্থতঃ তাঁদের জেহাদ নিশ্চিত রূপেই আল্লাহ্র পথে ছিল এবং এতে তাঁরা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনার পরওয়া করেননি।

আয়াতের শেষভাগে এ পরম সত্যটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, এসব গুণ, এগুলোর যথাসময়ে প্রয়োগ, এগুলোর মাধ্যমে ইসলামী জেহাদে সাফল্য অর্জন প্রভৃতি বিষয় শুধুমাত্র চেষ্টা-তদবীর, শক্তি অথবা দলের জোরে অর্জিত হয় না, বরং এ সবই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ। তিনিই যাকে ইচ্ছা এ অনুগ্রহ দান করেন।

উপরোক্ত চার আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে ধনাত্মকভাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্ব ও বিশেষ বন্ধুত্ব যাদের সাথে স্থাপিত হতে পারে, তারা কারা? এ প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা ও অতঃপর তাঁর রসূলের উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের বন্ধু ও সাথী সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাই আছেন এবং তিনিই হতে পারেন। তাঁর সম্পর্ক ছাড়া যত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব আছে, সবই ধ্বংসশীল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর সম্পর্কও প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলারই সম্পর্ক; পৃথক নয়। তৃতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সাথী ও আন্তরিক বন্ধু ঐসব মুসলমানকে সাব্যস্ত করা হয়েছে, যারা শুধু নামে নয়– সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

প্রথমত : الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُونَ – তাঁরা পূর্ণ আদব ও শর্তাদিসহ নিয়মিত নামায পড়ে। দ্বিতীয়তঃ স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করে। তৃতীয়তঃ তারা বিনম্র ও বিনয়ী; স্বীয় সৎকর্মের জন্যে গর্বিত নয়।

তৃতীয় বাক্য وَهُمْ رٰكِعُونَ এ ركوع শব্দের কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে রুকূর অর্থ পারিভাষিক রুকূ, যা নামাযের একটি রোকন। يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ – এর পর وَهُمْ رٰكِعُونَ বাক্যটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য মুসলমানদের নামাযকে অপরাপর সম্প্রদায়ের নামায থেকে ভিন্নরূপে প্রকাশ করা। কারণ, ইহুদী

ও খ্রীষ্টানরাও নামায পড়ে, কিন্তু তাদের নামাযে রুকূ নেই। রুকূ একমাত্র ইসলামী নামাযেরই স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য। – (মাযহারী)

কিন্তু অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন ঃ এখানে রুকূ শব্দ দ্বারা আভিধানিক অর্থই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, নত হওয়া, বিনয়, নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করা। বাহরেমুহীত গ্রন্থে আবু হাইয়্যান এবং কাশশাফ গ্রন্থে যমখশরী এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তফসীরে মাযহারী এবং বয়ানুল-কোরআনেও এ অর্থই নেওয়া হয়েছে। অতএব, বাক্যটির অর্থ হবে এই যে, তারা স্বীয় সৎকর্মের জন্যে গর্ব করে না, বরং বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাব।

কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে, এবাক্যটি হযরত আলী (রাঃ)-এর বিশেষ একটি ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন হযরত আলী (রাঃ) নামায পড়ছিলেন। যখন তিনি রুকূতে গেলেন, তখন জনৈক ভিক্ষুক কিছু ভিক্ষা চাইল। তিনি রুকূ অবস্থায়ই অঙ্গুলি থেকে আংটি বের করে ভিক্ষুকের দিকে নিক্ষেপ করে দিলেন। নামায শেষে ভিক্ষুকের প্রয়োজন মিটাবেন, এতটুকু দেরী করাও তিনি পছন্দ করেননি। তিনি সৎকাজে যে দ্রুততা প্রদর্শন করলেন, তা আল্লাহ্ তাআলার খুব পছন্দ হয় এবং আলোচ্য বাক্যের মাধ্যমে তার মূল্য দেওয়া হয়।

এ রেওয়ায়েতের সনদ আলেম ও হাদীছবিদ্দের মতে সর্বসম্মত নয়। তবে রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ সাব্যস্ত হলে এর সারমর্ম হবে এই যে, মুসলমানদের গভীর বন্ধুত্বের যোগ্য তারাই হবে, যারা নামায ও যাকাতের পাবন্দি করে। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে বিশেষভাবে হযরত আলী (রাঃ) এ বন্ধুত্বের অধিক যোগ্য।

হযরত আলী (রাঃ)-কে এ বিশেষ সম্মানে ভূষিত করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) – এর অর্ন্তদৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ গোলযোগের ঘটনাবলী ফুটে উঠেছিল যে, কিছু লোক হযরত আলী (রাঃ) – এর শত্রুতায় মেতে উঠবে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করবে। খারেজী সম্প্রদায়ের গোলযোগের দরুন পরবর্তী কালে তাই প্রকাশ পেয়েছে।

মোটকথা, আয়াতটি এ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও আয়াতের ভাষা ব্যাপক; ছাহাবায়ে কেরাম ও সব মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত। বক্তব্যের দিক দিয়ে কোন এক ব্যক্তির সাথে আয়াতের বিশেষত্ব নেই। এ কারণেই হযরত ইমাম বাকের (রাঃ)-কে যখন কেউ জিজ্ঞেস করল ঃ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আয়াতে কি হযরত আলী (রহঃ)-কে বুঝানো হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন ঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে তিনি আয়াতের লক্ষণভুক্ত।

অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে যারা কোরআনের নির্দেশ পালন করে বিজাতির সাথে গভীর বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকে এবং শুধু আল্লাহ্, রসূল ও মুসলমানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে বিজয় ও বিশ্বজয়ী হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ

এতে বলা হয়েছে যে, যেসব মুসলমান আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পালন করে, তারা আল্লাহ্র দল। এরপর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, পরিণামে আল্লাহ্র দলই সবার উপর জয়ী হবে।

পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে সবাই প্রত্যক্ষ করে নিয়েছে যে, ছাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ) সবার উপর জয়ী হয়েছেন। যে শক্তিই এ পাহাড়ে মাথা ঠুকেছে, সে-ই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম খলিফার বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সবার বিরুদ্ধে বিজয়ী করেন। হযরত ফারূকে আযম (রাঃ) – এর মোকাবিলায় বিশ্বের বৃহৎ শক্তিদ্বয় কায়সার ও কেস্রা অবতীর্ণ হলে আল্লাহ্ তাআলা তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মিটিয়ে দেন। তাঁদের পর খলিফা ও মুসলমানদের মধ্যে যতদিন আল্লাহ্র এসব নির্দেশ পালন অব্যাহত রয়েছে এবং মুসলমানরা বিজাতির সাথে মেলামেশা ও গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে বিরত রয়েছে, ততদিন তাদেরকে বিজয়ী বেশেই দেখা গেছে।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ دِينَكُمْ
هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ
وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَ
إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ هَلْ تَنقِمُونَ
مِنَّآ إِلَّآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن
قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ
مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ
مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّٰغُوتَ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ شَرٌّ
مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا۟
ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُوا۟ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا۟ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ
أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا۟ يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَٰرِعُونَ
فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟
يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن
قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾

*(৫৭) হে মুমিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহ্কে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। (৫৮) আর যখন তোমরা নামাযের জন্যে আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ। (৫৯) বলুন ঃ হে আহলে-কিতাবগণ, আমাদের সাথে তোমাদের এছাড়া কি শত্রুতা যে, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি আল্লাহ্র প্রতি, আমাদের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি এবং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থের প্রতি। আর তোমাদের অধিকাংশই নাফরমান। (৬০) বলুন ঃ আমি তোমাদেরকে বলি, তাদের মধ্যে কার মন্দ প্রতিফল রয়েছে আল্লাহ্র কাছে? যাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। (৬১) যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, তখন বলে দাও ঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি। অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল এবং কুফর নিয়েই প্রস্থান করেছে। তারা যা গোপন করত, আল্লাহ্ তা খুব জানেন। (৬২) আর আপনি তাদের অনেককে দেখবেন যে, দৌড়ে দৌড়ে পাপে, সীমালঙ্ঘনে এবং হারাম ভক্ষণে পতিত হয়। তারা অত্যন্ত মন্দ কাজ করছে। (৬৩) দরবেশ ও আলেমরা কেন তাদেরকে পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করে না? তারা খুবই মন্দ কাজ করছে।*

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

৫৭ আয়াতে তাকীদের জন্যে রুকুর শুরুভাগে বর্ণিত নির্দেশের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ, হে বিশ্বাসী, তোমরা তাদেরকে সাথী অথবা ঘনিষ্ঠ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে। এরা দুই দলে বিভক্ত ঃ (এক) আহলে-কিতাব সম্প্রদায়, (দুই) সাধারণ কাফের ও মুশরিক সম্প্রদায়।

আবু হাইয়্যান বাহরে-মুহীত গ্রন্থে বলেন ঃ كفار শব্দে আহলে-কিতাব সম্প্রদায়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবুও এখানে স্বতন্ত্রভাবে আহলে-কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, আহলে-কিতাবরা অন্যান্য কাফেরদের তুলনায় যদিও বাহ্যতঃ ইসলামের নিকটবর্তী, কিন্তু অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, তাদের কমসংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) –এর আমল ও তৎপরবর্তী আমলে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাদের সংখ্যা পর্যালোচনা করলে সাধারণ কাফেরদের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। আহলে-কিতাবদের মধ্যে যারা মুসলমান হয়েছে, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

এর কারণ এই যে, আহলে-কিতাবদের গর্ব ছিল যে, তারা খোদায়ী ধর্ম ও ঐশীগ্রন্থের অনুসারী। এ গর্ব ও অহঙ্কারই তাদেরকে সত্যধর্ম গ্রহণে বিরত রেখেছে। মুসলমানদের সাথে তারাই বেশীর ভাগ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে। এ দুষ্টামির একটি ঘটনা সপ্তম আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا – অর্থাৎ, মুসলমানরা যখন নামাযের আযান দেয়, তখন তারা হাসি-তামাশা করে। তফসীরে-মাযহারীতে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ মদীনায় জনৈক খ্রীষ্টান বসবাস করত। সে আযানে যখন اشهد ان محمدا رسول الله বাক্যটি শুনত, তখন বলত অর্থাৎ, আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীকে পুড়িয়ে ভস্মীভূত করুক।

পরিণামে তার এ বাক্যটিই তার গোটা পরিবার পুড়ে ভস্মীভূত হওয়ার কারণ হয়ে যায়। এক রাত্রে সে যখন ঘুমিয়েছিল, তার চাকর প্রয়োজন বশতঃ আগুন নিতে ঘরে প্রবেশ করল। আগুনের স্ফুলিঙ্গ উড়ে সবার অজ্ঞাতে কোন একটি কাপড়ে গিয়ে পড়ল। এরপর সবাই যখন নিদ্রায় বিভোর, তখন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং সবাই পুড়ে কাবাব হয়ে গেল।

এ আয়াতের শেষ ভাগে বলা হয়েছে ঃ

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ – অর্থাৎ, সত্যধর্মের সাথে ঠাট্টা-মস্কারা করার কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা নির্বোধ।

তফসীরে-মাযহারীতে কাযী ছানাউল্লাহ্ (রঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে নির্বোধ বলেছেন, অথচ সাংসারিক ব্যাপারে তাদের বুদ্ধিমত্তার জুড়ি নেই। এতে বোঝা যায় যে, একজন লোক এক ধরনের কাজে চতুর ও বুদ্ধিমান এবং অন্য ধরনের কাজে নির্বোধ ও বোকা হতে পারে। এ বোকা হওয়ার কারণ দ্বিবিধ – হয় সে বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, না হয় তার বুদ্ধি এ ব্যাপারে অচল। কোরআন পাক এ বিষয়বস্তুটি অন্য এক আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছে ঃ

يَعْلَمُونَ ظَٰهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْءَاخِرَةِ هُمْ غَٰفِلُونَ

অর্থাৎ, তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়গুলো খুব বোঝ, কিন্তু পরিণাম ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন।

أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ – বাক্যে আল্লাহ্ তাআলা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে সম্বোধন করে সবার পরিবর্তে অধিকাংশকে ঈমান থেকে বিচ্যুত বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, তাদের কিছুসংখ্যক লোক এমনও ছিল, যারা সর্বাবস্থায় ঈমানদার ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল তওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলীর অনুসারী এবং এতদুভয়ে বিশ্বাসী। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তি ও কোরআন অবতরণের পর তারা তাঁর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কোরআন অনুসারে কাজকর্ম সম্পাদন করতে থাকে।

**প্রচারকার্যে সম্বোধিত ব্যক্তির রেয়াত করা ঃ** قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ বাক্যে উদাহরণের ভঙ্গিতে আল্লাহ্র অভিশাপ ও ক্রোধপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে সম্বোধিত ব্যক্তিদেরই অবস্থা ছিল। কাজেই এ দোষ সরাসরি তাদের উপর আরোপ করে 'তোমরা এরূপ' বললেও চলত। কিন্তু কোরআন এ বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে বিষয়টিকে একটি উদাহরণের রূপ দিয়েছে। এতে পয়গম্বরসুলভ একটি প্রচারকার্যের বিশেষ পদ্ধতি ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, বর্ণনাভঙ্গি এরূপ হওয়া চাই, যদ্দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তির মনে উত্তেজনা সৃষ্টি না হয়।

**ইহুদীদের চারিত্রিক বিপর্যয় ঃ** প্রথম আয়াতে অধিকাংশ ইহুদীর চারিত্রিক বিপর্যয় ও কর্মগত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে – যাতে শ্রোতারা উপদেশ গ্রহণ করে এবং এসব কার্যকলাপ ও তার কারণ থেকে আত্মরক্ষা করে।

যদিও সাধারণভাবে ইহুদীদের অবস্থা তাই ছিল, তথাপি তাদের মধ্যে কিছু ভাল লোকও ছিল। কোরআন পাক তাদের ব্যক্তিক্রম প্রকাশ করার জন্যে كثيرا (অনেকে) শব্দটি ব্যবহার করেছে। সীমালঙ্ঘন এবং হারাম ভক্ষণ اثم (পাপ) শব্দের অর্থেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উভয় প্রকার পাপের ধ্বংসকারিতা এবং সে কারণে শাস্তি ও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্যে বিশেষভাবে এগুলোকে পৃথক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।—(বাহরে-মুহীত)

তফসীরে রূহুল মা'আনী প্রভৃতিতে বলা হয়েছে যে, তাদের সম্পর্কে 'দৌড়ে দৌড়ে পাপে পতিত হওয়ার' শিরোনাম ব্যবহার করে কোরআন পাক ইঙ্গিত করেছে যে, তারা এসব কু-অভ্যাসে অভ্যস্ত অপরাধী এবং এসব কুকর্ম মজ্জাগত হয়ে তাদের শিরা-উপশিরায় জড়িত হয়ে গেছে। এখন তারা ইচ্ছা না করলেও সেদিকেই চলে।

এতে বোঝা যায় যে, মানুষ সৎ কিংবা অসৎ যে কোন কাজ উপর্যুপরি করতে থাকলে আস্তে আস্তে তা মজ্জাগত অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এরপর তা করতে তার কোনরূপ কষ্ট ও দ্বিধা হয় না। ইহুদীরা কু-অভ্যাসে এ সীমায়ই পৌঁছে গিয়েছিল। এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্যে বলা হয়েছেঃ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ (তারা দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে পাপে পতিত হয়।) সৎকর্মে পয়গম্বর ও ওলীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁদের সম্পর্কেও কোরআন বলেছে ঃ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ, তাঁরা দৌড়ে দৌড়ে পুণ্য কাজে আত্মনিয়োগ করে।

**কর্ম সংশোধনের পদ্ধতি ঃ** সূফী-বুযুর্গ ও ওলী-আল্লাহ্গণ কর্ম সংশোধনে সবচাইতে অধিক যত্নবান। তাঁরা কোরআন পাকের এসব বাণী থেকেই এ মূলনীতি বেছে নিয়েছেন যে, মানুষ যেসব ভাল কিংবা মন্দ কাজ করে, আসলে সেগুলোর মূল উৎস হচ্ছে ঐসব গোপন কর্মক্ষমতা ও চরিত্র, যা মানুষের মজ্জায় পরিণত হয়। এ কারণেই মন্দ কর্ম ও অপরাধ দমন করার জন্যে তাঁদের দৃষ্টি এসব সূক্ষ্ম গোপন বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকে এবং তাঁরা এগুলো সংশোধন করে দেন। ফলে সব কাজ-কর্ম আপনা থেকেই সংশোধিত হয়ে যায়। উদাহরণতঃ কারও অন্তরে জাগতিক অর্থলিপ্সা প্রবল হলে সে এর ফলে ঘুষ গ্রহণ করে, সুদ খায় এবং সুযোগ পেলে চুরি, ডাকাতি পর্যন্ত করতে উদ্যত হয়। সূফী বুযুর্গরা এসব অপরাধের পৃথক পৃথক প্রতিকার না করে এমন ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করেন, যদ্দরুন এসব অপরাধের ভিত্তিই উৎপাটিত হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কল্পনায় একথা বদ্ধমূল করে দেন যে, এ জগৎ ক্ষণস্থায়ী এবং এর আরাম-আয়েশ বিষাক্ত।

এমনিভাবে মনে করুন, কেউ অহঙ্কারী কিংবা ক্রোধের হাতে পরাভূত। সে অন্যকে ঘৃণা ও অপমান করে এবং বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে। সূফী বুযুর্গরা এমন লোকের ক্ষেত্রে পরকালের চিন্তা এবং আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহির ব্যবস্থাপত্র প্রয়োগ করেন। ফলে উপরোক্ত মন্দ অভ্যাস আপনা থেকেই খতম হয়ে যায়।

মোটকথা, এ কোরআনী ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের মধ্যে এমন কিছু কর্মক্ষমতা রয়েছে, যা মজ্জায় পরিণত হয়ে যায়। এগুলো সৎ কর্মক্ষমতা হলে সৎকাজ আপনা-আপনি হতে থাকে। পক্ষান্তরে এগুলো মন্দ কর্মক্ষমতা হলে মন্দ কাজের দিকে মানুষ আপনা-আপনি ধাবিত হয়। কর্ম সংশোধনের নিমিত্ত এসব কর্মক্ষমতার সংশোধন অত্যাবশ্যক।

**আলেমদের কাঁধে সর্বসাধারণের কাজ-কর্মের দায়িত্ব ঃ** দ্বিতীয় আয়াতে ইহুদী পীর-মাশায়েখ ও আলেমদেরকে কঠোরভাবে হুশিয়ার করা হয়েছে যে, তারা সাধারণ মানুষকে মন্দকাজ থেকে কেন বিরত রাখে না? কোরআন পাকে এক্ষেত্রে দু'টি শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি ربانيون – এর অর্থ আল্লাহ্ভক্ত; অর্থাৎ, আমাদের পরিভাষায় যাকে দরবেশ, পীর কিংবা মাশায়েখ বলা হয়। দ্বিতীয় শব্দ احبار ব্যবহার করা হয়েছে। ইহুদীদের আলেমদেরকে 'আহ্বার' বলা হয়। এতে বোঝা যায় যে, 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' —এর মূল দায়িত্ব এ দু'শ্রেণীর কাঁধেই অর্পিত – (এক) পীর ও মাশায়েখ এবং (দুই) আলেমবর্গ। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন ঃ ربانيون বলে ঐসব আলেমকে বুঝানো হয়েছে, যারা সরকারের পক্ষ থেকে আদিষ্ট ও ক্ষমতাসীন এবং احبار বলে সাধারণ আলেমবর্গকে বোঝানো হয়েছে। এমতাবস্থায় অপরাধ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব শাসককুল ও আলেমকুল উভয়ের কাঁধে ন্যস্ত হয়ে যায়। অন্যান্য কতিপয় আয়াতে এ বিষয়টি স্পষ্টরূপে বর্ণিতও হয়েছে।

**আলেম ও পীর-মাশায়েখের প্রতি হুশিয়ারী ঃ** আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ – অর্থাৎ, 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ' করার কর্তব্যটি ত্যাগ করে এসব মাশায়েখ ও আলেম অত্যন্ত বদভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে; জাতিকে ধ্বংসের দিকে যেতে দেখেও তারা বাধা দিচ্ছে না।

তফসীরবিদ আলেমগণ বলেন, প্রথম আয়াতে সর্বসাধারণের দুষ্কর্ম বর্ণিত হয়েছিল। এর শেষে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ বলা হয়েছে এবং

দ্বিতীয় আয়াতে মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এর শেষে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ বলা হয়েছে। কারণ এই যে, আরবী অভিধানের দিক দিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত সব কাজকেই فعل বলা হয়। عمل শব্দটি ঐ কাজকে বোঝাবার জন্যে ব্যবহার করা হয়, যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয় এবং صنع ও صنعت শব্দ ঐ কাজের বেলায় প্রয়োগ করা হয়, যা ইচ্ছার সাথে সাথে বারবার অভ্যাস ও লক্ষ্য হিসেবে ঠিক করে করা হয়। তাই সর্বসাধারণের কুকর্মের পরিণতির ক্ষেত্রে শুধু عمل শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ আর বিশিষ্ট মাশায়েখ ও আলেমদের ভ্রান্ত কাজের জন্য صنع শব্দ প্রয়োগে لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ বলা হয়েছে। এতে এদিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ইহুদীদের মাশায়েখ ও আলেমরা জানত যে, তারা নিষেধ করলে সর্বসাধারণ শুনবে এবং বিরত থাকবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপঢৌকনের লোভে কিংবা মানুষের বদধারণার ভয়ে তাদের মাশায়েখ ও আলেমদের মনে সত্য সমর্থন করার কোন আবেদন জাগ্রত হত না। এ নিস্পৃহতা সেসব দুষ্কর্মীর দুষ্কর্মের চাইতেও গুরুতর অপরাধ।

এর সারমর্ম এই যে, কোন জাতি অপরাধ ও পাপে লিপ্ত হলে তাদের মাশায়েখ ও আলেমরা যদি অবস্থাদৃষ্টে বুঝতে পারে যে, তারা নিষেধ করলে জাতি অপরাধ থেকে বিরত হবে, তবে এমতাবস্থায় কোন লোভ কিংবা ভয়ের কারণে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত না রাখলে মাশায়েখ ও আলেমদের অপরাধ প্রকৃত অপরাধীদের অপরাধের চাইতেও গুরুতর হবে। তাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মাশায়েখ ও আলেমদের জন্যে সমগ্র কোরআনে এ আয়াতের চাইতে কঠোর হুশিয়ারী আর কোথাও নাই। তফসীরবিদ যাহ্হাক বলেন ঃ আমার মতে মাশায়েখ ও আলেমদের জন্যে এ আয়াত সর্বাধিক ভয়াবহ। – (ইবনে জরীর ও ইবনে কাসীর)

কারণ এই যে, এ আয়াতদৃষ্টে তাদের অপরাধ সব চোর, ডাকাত ও দুষ্কর্মীদের অপরাধের চাইতেও কঠোর হয়ে যায় –(নাউযুবিল্লাহ্) । কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, অপরাধের এ তীব্রতা তখনই হবে, যখন মাশায়েখ ও আলেমরা অবস্থাদৃষ্টে অনুমানও করতে পারবেন যে, তাদের নিষেধাজ্ঞা শোনা ও মান্য করা হবে। পক্ষান্তরে যদি অবস্থাদৃষ্টে কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁদের নিষেধাজ্ঞা শুনবে না; বরং উল্টা তাদেরকে নির্যাতন করা হবে, তবে তাঁরা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন। কিন্তু উত্তম ও শ্রেষ্ঠ তরীকা তখনও এই যে, কেউ মানুক বা না মানুক, তারা স্বীয় কর্তব্য পালন করে যাবেন এবং এ ব্যাপারে কারও নির্যাতন বা তিরস্কারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না। যেমন, কয়েক আয়াত পূর্বে আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় মুজাহিদদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্র পথে এবং সত্য প্রকাশে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরওয়া করে না।

মোটকথা, যে ক্ষেত্রে কথা শোনা ও মান্য করার সম্ভাবনা বেশী, সেখানে মাশায়েখ ও আলেম বরং প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে সাধ্যানুযায়ী পাপ কাজে বাধা দান করবে; হাতে হোক কিংবা মুখে অথবা কমপক্ষে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে নিবে। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে প্রবল বিশ্বাস জন্মে যে, নিষেধাজ্ঞা শোনা হবে না অথবা নিষেধকারীর বিরুদ্ধে শত্রুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, সেখানে নিষেধ করা ও বাধা দান করা ফরয নয়, তবে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ অবশ্যই। 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ' সম্পর্কিত এ বিবরণ হাদীস থেকে সংগৃহীত হয়েছে। নিজে সৎকর্ম করা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে অপরকেও সৎকর্মের প্রতি পথ প্রদর্শন করা এবং অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সাধারণ মুসলমান এবং বিশেষ করে মাশায়েখ ও আলেমদের উপর ন্যস্ত করে ইসলাম জগতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার স্বর্ণাক্ষরে লেখার যোগ্য একটি মূলনীতি স্থাপন করেছে। এটি যথাযথ বাস্তবায়িত হলে সমগ্র জাতি অনায়াসেই যাবতীয় দুর্নীতি থেকে পবিত্র হতে পারে।

**উম্মতের সংশোধনের পন্থা ঃ** ইসলামের প্রথম ও পরবর্তী সময় শতাব্দীগুলোতে যতদিন এ মূলনীতি বাস্তবায়িত হয়েছে, ততদিন মুসলিম জাতি জ্ঞান–গরিমা, কর্ম ও চরিত্রের দিক দিয়ে সারা বিশ্বে সমুন্নত ও স্বতন্ত্র রয়েছে। পক্ষান্তরে যেদিন থেকে মুসলমানরা এ কর্তব্য পালনে বিমুখ হয়ে পড়েছে এবং অপরাধ দমনকে শুধু সরকার ও পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব মনে করে নিজেরা হাত গুটিয়ে বসেছে, সেদিন থেকেই মুসলমানদের অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করেছে। আজ পিতা–মাতা ও গোটা পরিবার ধার্মিক ও শরীয়তের অনুসারী; কিন্তু সন্তান–সন্ততি ও আত্মীয়–স্বজনের অবস্থা এর বিপরীত। তাদের মতিগতি, চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত। একারণেই জাতির সামগ্রিক সংশোধনের নিমিত্ত কোরআন ও হাদীসে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ'–এর প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। কোরআন এ কর্তব্যটিকে উম্মতে–মোহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য আখ্যা দিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধাচারণ করাকে কঠোর পাপ ও শাস্তির কারণ বলে সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ কোন জাতির মধ্যে যখন পাপ কাজ করা হয় অথচ কোন লোক তা নিষেধ করে না, তখন তাদের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আযাব প্রেরণের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে যায়। – (বাহরে মুহীত)

**পাপ কাজে ঘৃণা প্রকাশ না করার কারণে সতর্কবাণী ঃ** মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলা এক জায়গায় ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক বস্তি ধ্বংস করে দাও। ফেরেশতারা আরয করলেন ঃ এ বস্তিতে আপনার অমুক এবাদতকারী বান্দাও রয়েছে। নির্দেশ এল ঃ তাকেও আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাও– আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখেও তার চেহারা কখনও ক্রোধে বিবর্ণ হয়নি।

হযরত ইউশা' ইবনে নূন (আঃ) —এর প্রতি ওহী আসে যে, আপনার জাতির এক লক্ষ লোককে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করা হবে। এদের মধ্যে চল্লিশ হাজার সৎ লোক এবং ষাট হাজার অসৎ লোক। ইউশা (আঃ) নিবেদন করলেন, হে রাব্বুল আলামীন, অসৎ লোকদেরকে ধ্বংস করার কারণ তো জানাই, কিন্তু সৎ লোকদেরকে কেন ধ্বংস করা হচ্ছে? উত্তর এল ঃ এ সৎলোকগুলোও অসৎলোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখত। তাদের সাথে পানাহার ও হাসি-তামাশায় যোগদান করত। আমার অবাধ্যতা ও পাপাচার দেখে কখনও তাদের চেহারায় বিতৃষ্ণার চিহ্নও ফুটে উঠেনি। – (বাহরে মুহীত)

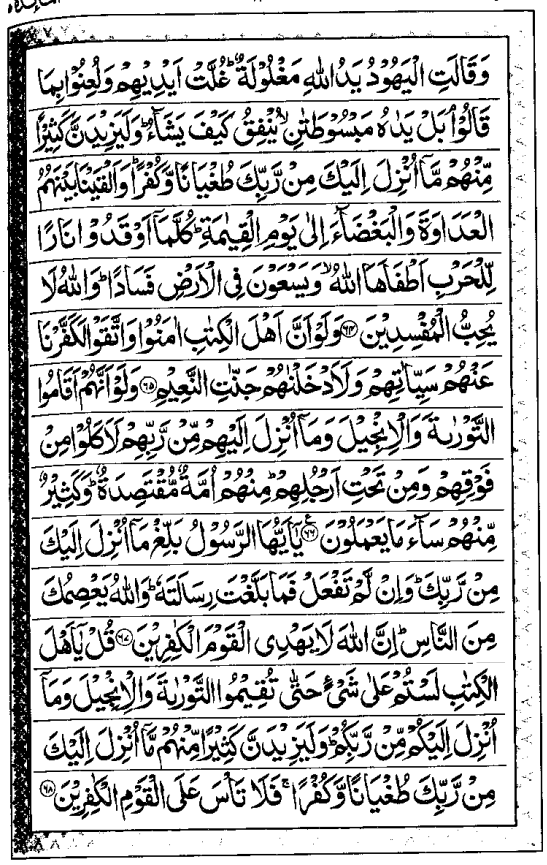

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا
قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا
مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا
لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا
عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا
التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ
مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿٦٦﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا
أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾

*(৬৪) আর ইহুদীরা বলেঃ আল্লাহ্‌র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। একথা বলার জন্যে তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন। আপনার প্রতি পালনকর্তার পক্ষ থেকে যে কালাম অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর পরিবর্ধিত হবে। আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে কেয়ামত পর্যন্ত শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিয়েছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত করে, আল্লাহ্ তা নির্বাপিত করে দেন। তারা দেশে অশান্তি উৎপাদন করে বেড়ায়। আল্লাহ্ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৬৫) আর যদি আহলে-কিতাবরা বিশ্বাস স্থাপন করত এবং খোদাভীতি অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের মন্দ বিষয়সমূহ ক্ষমা করে দিতাম এবং তাদেরকে নেয়ামতের উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করতাম। (৬৬) যদি তারা তওরাত, ইঞ্জীল এবং যা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, পুরোপুরি পালন করত, তবে তারা উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে ভক্ষণ করত। তাদের কিছুসংখ্যক লোক সৎপথের অনুগামী এবং অনেকেই মন্দ কাজ করে যাচ্ছে। (৬৭) হে রসূল, পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। আল্লাহ্ আপনাকে মানুষের কাছ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬৮) বলে দিনঃ হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা কোন পথেই নও, যে পর্যন্ত না তোমরা তওরাত, ইঞ্জীল এবং যে গ্রন্থ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাও পুরোপুরি পালন না কর। আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও কুফর বৃদ্ধি পাবে। অতএব, এ কাফের সম্প্রদায়ের জন্যে দুঃখ করবেন না।*

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**ইহুদীদের একটি ধৃষ্টতার জওয়াব ঃ** وَقَالَتِ الْيَهُودُ আয়াতে ইহুদীদের একটি গুরুতর অপরাধ ও জঘন্য উক্তি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, হতভাগারা বলতে শুরু করেছে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তাআলা দরিদ্র হয়ে গেছেন।

ঘটনাটি ছিল এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মদীনার ইহুদীদেরকে বিত্তশালী ও স্বাচ্ছন্দ্যশীল করেছিলেন, কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় আগমন করেন এবং তাদের কাছে ইসলামের আহবান পৌঁছে, তখন পাষণ্ডরা সামাজিক মোড়লি ও কুপ্রথার মাধ্যমে প্রাপ্ত নযর-নিয়াযের খাতিরে এ আহবান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে আল্লাহ্ তাআলা শাস্তি হিসেবে তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হ্রাস করে দেন। ফলে তারা দরিদ্র হয়ে পড়ে। তখন মূর্খদের মুখ থেকে এ জাতীয় কথাবার্তা বের হয়ে থাকে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে অথবা আল্লাহ্ তাআলা কৃপণ হয়ে গেছেন। এর উত্তরে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হাত তো তাদেরই বাঁধা হবে এবং তাদের প্রতি অভিসম্পাত হবে, যার ফলে পরকালে আযাব এবং ইহকালে লাঞ্ছনা ও অবমাননা ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলার হাত সব সময়ই উন্মুক্ত রয়েছে। তাঁর দান চিরকাল অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে। কিন্তু তিনি যেমন ধনবান ও বিত্তশালী, তেমনি সুবিজ্ঞও বটে। তিনি বিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্যয় করেন; যাকে উপযুক্ত মনে করেন, বিত্তশালী করে দেন এবং যার ঘাড়ে উপযুক্ত মনে করেন, অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য চাপিয়ে দেন।

অতঃপর বলেছেন ঃ এরা উদ্ধত জাতি। আপনার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনী নির্দেশাবলীর দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তাদের কুফর ও অবিশ্বাস আরও কঠোর হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশে তাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ঘোর মতানৈক্য সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। ফলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে সাহসী হয় না এবং তাদের কোন চক্রান্তও সফল হয় না। كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ বাক্যে প্রকাশ্য যুদ্ধে ব্যর্থতা এবং وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا বাক্যে গোপন চক্রান্তে ব্যর্থতার কথাই বর্ণিত হয়েছে।

**খোদায়ী নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালনে ইহকালীন কল্যাণ ঃ** ৬৪তম আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইহুদীরা তওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলী এবং পয়গম্বরগণের বাণী দ্বারা কোন উপকার লাভ করেনি এবং জাগতিক লোভ-লালসায় লিপ্ত হয়ে সবকিছু বিস্মৃত হয়ে বসেছে। ফলে দুনিয়াতেও এরা কপর্দকহীন হয়ে পড়েছে। যদি এখনও তারা বিশ্বাস ও খোদাভীতি অবলম্বন করে, তবে আমি তাদের বিগত সব গোনাহ্ মাফ করে দেব এবং নেয়ামতপূর্ণ উদ্যান দান করব।

**খোদায়ী নির্দেশাবলী পুরোপুরি পালন করার উপায় ঃ** وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ আয়াতে ঐ বিশ্বাস ও খোদা ভীতির কিছু বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে, যদ্দ্বারা জাগতিক কল্যাণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দানের ওয়াদা পূর্ববর্তী আয়াতে করা হয়েছিল। বিবরণ এই যে, ইহুদীরা তওরাত, ইঞ্জীল এবং পরবর্তী সর্বশেষ গ্রন্থ কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত করুক। এখানে عمل তথা পালন করার পরিবর্তে اقامت তথা প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, এসব গ্রন্থের আমল পুরোপুরি ও বিশুদ্ধ তখনই হবে, যখন তাতে কোন রকম ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি না থাকবে। যেমন, কোন স্তম্ভকে তখনই প্রতিষ্ঠিত বলা যায়, যখন তা কোনদিকে ঝুঁকে থাকবে না বরং সোজা দাঁড়ানো থাকবে।

এর সারমর্ম এই যে, যদি ইহুদীরা আজও তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন পাকের নির্দেশাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেগুলো পুরোপুরি পালন করে—ত্রুটি এবং মনগড়া বিষয়াদিকে ধর্ম বলে আখ্যা দিয়ে বাড়াবাড়ি না করে, তবে তারা পরকালের প্রতিশ্রুত নেয়ামতরাজির যোগ্য হবে এবং ইহকালেও তাদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। ফলে উপর-নীচ সবদিক থেকে তাদের উপর রিযিক বর্ষিত হবে। 'উপর-নীচে'র বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে তারা অনায়াসে ও অব্যাহতভাবে রিযিক প্রাপ্ত হবে।— (তফসীরে-কবীর)

পূর্ববর্তী আয়াতে শুধু পরকালের নেয়ামতের ওয়াদা ছিল। আলোচ্য আয়াতে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ওয়াদাও বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে, ইহুদীদের কুকর্ম এবং তওরাত ও ইঞ্জীলের নির্দেশাবলী পরিবর্তনের বড় কারণ ছিল তাদের সংসার-প্রীতি ও অর্থলিপ্সা। এ মোহই তাদেরকে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও সেগুলো মেনে নিতে বাধা প্রদান করছিল। তাদের আশঙ্কা ছিল এই যে, তারা মুসলমান হয়ে গেলে তাদের মোড়লি শেষ হয়ে যাবে এবং ধর্মীয় নেতা হওয়ার কারণে যেসব হাদিয়া ও উপঢৌকন পাওয়া যায়, তা বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের এ আশঙ্কা দূর করার জন্যে ওয়াদাও করেছেন যে, তারা সাচ্চা ঈমানদার ও সৎকর্মী হয়ে গেলে তাদের জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশ হ্রাস পাবে না, বরং আরও বেড়ে যাবে।

**একটি সন্দেহ নিরসন ঃ** এ বিবরণ থেকে একথা জানা গেল যে, এই বিশেষ ওয়াদাটি ঐসব ইহুদীর জন্য করা হয়েছে, যারা মহানবী (সাঃ)-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। তারা এসব নির্দেশ মেনে নিলে ইহকালেও তাদেরকে সব রকম নেয়ামত ও শান্তি প্রদান করা হত। সেমতে তখন যারা ঈমান ও সৎকর্ম অবলম্বন করেছে, তারা এসব নেয়ামত পুরোপুরিভাবেই লাভও করেছে। যেমন, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী ও আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ। এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে-ই ইহকালে অবশ্যম্ভাবীরূপে অগাধ ধন-দৌলতের অধিকারী হবে এবং যে এরূপ না করবে, সে অবশ্যই অভাব-অনটনে পতিত হবে। কারণ, এ স্থলে কোন সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি বিশেষ দলের সাথে বিশেষ অবস্থায় ওয়াদা করা হয়েছে।

তবে সাধারণ নীতি হিসেবে ঈমান ও সৎকর্মের ফলস্বরূপ পবিত্র-জীবন প্রাপ্ত হওয়ার ওয়াদা রয়েছে। এটি অগাধ ধন-দৌলতের আকারেও হতে পারে কিংবা বাহ্যিক অভাব-অনটনের আকারেও। পয়গম্বর ও ওলীদের অবস্থাই এর প্রমাণ। তাঁরা সবাই অগাধ-ধন-দৌলত প্রাপ্ত হননি, তবে পবিত্র-জীবন অবশ্যই প্রাপ্ত হয়েছেন।

আয়াতের শেষাংশে ইনসাফ প্রদর্শনার্থ একথাও বলা হয়েছে যে, ইহুদীদের যেসব বক্রতা ও কুকর্ম বর্ণনা করা হয়েছে, তা সব ইহুদীর অবস্থা নয় বরং مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ অর্থাৎ, তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল সৎপথের অনুসারীও রয়েছে। তবে তাদের অধিকাংশই কুকর্মী। সৎপথের অনুসারী বলে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা পূর্বে ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছিল, এরপর কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে।



**প্রচারকার্যের তাকিদ ও রসূল (সাঃ)-এর প্রতি সান্ত্বনা ঃ** এ আয়াতদ্বয়ে এবং এর পূর্ববর্তী উপর্যুপরি দুই রুকূতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের বক্রতা, বিপথগামিতা, হঠকারিতা এবং ইসলাম বিরোধী ষড়যন্ত্র বর্ণিত হয়েছে। মানুষ হিসেবে এর একটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এরূপ হওয়াও সম্ভবপর ছিল যে, এর ফলে মহানবী (সাঃ) নিরাশ হয়ে পড়তেন কিংবা বাধ্য হয়ে প্রচারকার্যে ভাটা দিতে পারতেন। আর এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এরূপও হতে পারত যে, তিনি বিরোধিতা, শত্রুতা ও নির্যাতনের পরওয়া না করে প্রচারকার্যে ব্যাপৃত থাকতেন, ফলে তাঁকে শত্রুর পক্ষ থেকে নানা রকম কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হত। তাই তৃতীয় আয়াতে এর দিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে জোরালো ভাষায় নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যাকিছু অবতরণ করা হয়, তার সম্পূর্ণটিই বিনা দ্বিধায় মানুষের কাছে পৌছে দিন; কেউ মন্দ বলুক অথবা ভাল, বিরোধিতা করুক কিংবা গ্রহণ করুক। অপরদিকে তাঁকে এ সংবাদ দিয়ে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, প্রচারকার্যে কাফেররা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং আপনার দেখাশোনা করবেন।

আয়াতের وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ বাক্যটি প্রণিধানযোগ্য—এর উদ্দেশ্য এই যে, যদি আপনি আল্লাহ্ তাআলার একটি নির্দেশও পৌছাতে বাকী রাখেন, তবে আপনি পয়গম্বরীর দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবেন না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আজীবন এ কর্তব্য পালনে পূর্ণ সাহসিকতা ও সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

**বিদায় হজ্বের সময় মহানবী (সাঃ)-এর একটি উপদেশ ঃ** বিদায় হজ্বের প্রসিদ্ধ ভাষণটি একদিক দিয়ে ছিল ইসলামের আইন এবং অপর দিক দিয়ে দয়ার সাগর, পিতা-মাতার চেয়েও অধিক স্নেহশীল পয়গম্বরের অন্তিম উপদেশ। এ ভাষণে তিনি সাহাবায়ে-কেরামের অভূতপূর্ব সমাবেশকে লক্ষ্য করে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করার পর প্রশ্ন করলেন ঃ الا هل بلغت শোন, আমি কি তোমাদের কাছে দ্বীন পৌছে দিয়েছি? সাহাবীগণ স্বীকার করলেন, জ্বি হাঁ, অবশ্যই পৌছে দিয়েছেন। এরপর বললেন ঃ তোমরা এ বিষয়ে সাক্ষী থেকো। তিনি আরও বললেন, فليبلغ الشاهد الغائب অর্থাৎ, এ সমাবেশে যারা উপস্থিত আছ, তারা আমার কথাটি অনুপস্থিতদের কাছেও পৌছে দিবে। অনুপস্থিত বলে দুই শ্রেণীর লোককে বোঝানো হয়েছে। (এক) যারা তখন দুনিয়াতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সমাবেশে উপস্থিত ছিল না এবং (দুই) যারা তখনো পর্যন্ত জন্মগ্রহণই করেনি। তাদের কাছে পয়গাম পৌছানোর পন্থা, ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। সাহাবী ও তাবেয়িগণ এ কর্তব্য যথাযথ পালন করেছেন।

এর প্রভাবেই সাধারণ অবস্থায় সাহাবায়ে-কেরাম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বাণী ও হাদীসকে আল্লাহ্ তাআলার একটি বিরাট আমানতের ন্যায় অনুভব করেছেন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ নিঃসৃত প্রত্যেকটি কথাই উম্মতের কাছে পৌছে দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। যদি কোন বিশেষ কারণ অথবা অক্ষমতার দরুন কেউ বিশেষ হাদীস অন্যের কাছে বর্ণনা না করতেন, তবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তা দু'চার জনকে অবশ্যই শুনিয়ে দিয়েছেন যাতে এ আমানতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন। সহীহ্ বোখারীতে হযরত মুয়ায (রাঃ)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে এমনি ধরনের এক ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। বলা হয়েছে ঃ اخبر به معاذ عند موته تاثما অর্থাৎ, এ আমানত না পৌছানোর কারণে গোনাহ্গার হওয়ার ভয়ে হযরত মুয়ায হাদীসটি মৃত্যুর সময় বর্ণনা করেছেন।

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ আয়াতের এ দ্বিতীয় বাক্যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, যে যত বিরোধিতাই করুক, শত্রুরা আপনার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

হাদীসে বলা হয়েছে ঃ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কয়েকজন সাহাবী দেহরক্ষী হিসেবে সাধারণভাবে মহানবী (সাঃ)-এর সাথে থাকতেন এবং গৃহে ও প্রবাসে তাঁকে প্রহরা দিতেন। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি সবাইকে বিদায় করে দেন। কারণ, এ দায়িত্ব আল্লাহ্ তাআলা স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

হযরত হাসান (রাঃ)-বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ প্রচারকার্যের নির্দেশ প্রাপ্তির পর আমার মনে বেশ ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। কারণ, চারদিক থেকে হয়ত সবাই আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং বিরোধিতা করবে। অতঃপর যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন ভয়-ভীতি দূর হয়ে অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়।— (তফসীরে-কবীর)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর প্রচারকার্যে কেউ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। অবশ্য যুদ্ধ ও জেহাদে সাময়িকভাবে কোনরূপ কষ্ট পাওয়া এর পরিপন্থী নয়।

**আহলে-কিতাবদের প্রতি শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশ ঃ** প্রথম আয়াতে আহলে-কিতাব ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে শরীয়ত অনুসরণের নির্দেশদান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যদি তোমরা শরীয়তের নির্দেশাবলী পালন না কর, তবে তোমরা কিছুই নও। উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামী শরীয়ত অনুসরণ না করলে তোমাদের যাবতীয় সাধুতা ও ক্রিয়াকর্ম পণ্ডশ্রম মাত্র। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে একটি সৃষ্টিগত মর্যাদা দান করেছেন ; অর্থাৎ, তোমরা পয়গম্বরদের বংশধর। দ্বিতীয়তঃ তওরাত ও ইঞ্জীলের শিক্ষাগত মর্যাদাও তোমাদের আয়ত্তাধীন; তোমাদের মধ্যে অনেক সাধু ব্যক্তিও রয়েছে। তারা আধ্যাত্মিক পথে পরিশ্রম ও সাধনা করে। কিন্তু এসব বিষয়ের মূল্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে তখনই হবে, যখন তোমরা ইসলামী শরীয়তের অনুসরণ করবে। এছাড়া কোন সম্পর্কই কাজে আসবে না এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরিশ্রম ও সাধ্য-সাধনার কোনটিতেই তোমাদের মুক্তি আসবে না।

এ আয়াত থেকে মুসলমানরাও নির্দেশ লাভ করেছে যে, শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ ব্যতীত সাধুতা, আধ্যাত্মিকতা, চেষ্টা-সাধনা, অন্তর্দৃষ্টিলাভ, এল্হাম ইত্যাদি দ্বারা মুক্তিলাভ করা যাবে না।

এ আয়াতে শরীয়ত অনুসরণের জন্যে তিনটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ প্রথম—তওরাত। দ্বিতীয়— ইঞ্জীল, যা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের কাছে পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তৃতীয় وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা প্রেরিত হয়েছে।

সাহাবা ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, এর মর্ম কোরআন পাক, যা খ্রীষ্টান ও ইহুদী সম্প্রদায়সহ সব উম্মতের জন্যেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। তাই আয়াতের অর্থ হবে এই যে, যে পর্যন্ত তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনের আনীত বিধি-বিধানগুলো বিশুদ্ধভাবে ও পূর্ণরূপে পালন না করবে, সে পর্যন্ত তোমাদের বংশগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং মর্যাদা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণীয় হবে না।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, আয়াতে তওরাত ও ইঞ্জীলের মত কোরআনেরও সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার না করে একটি দীর্ঘ বাক্য وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ব্যবহার করা হয়েছে। এর তাৎপর্য এই যে, এতে কতিপয় হাদীসের বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। এসব হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার কোরআন দেয়া হয়েছে, তেমনি অন্যান্য তত্ত্বকথা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। এগুলোকে এক দিক দিয়ে কোরআনের ব্যাখ্যাও বলা যেতে পারে। হাদীসের ভাষ্য এরূপ ঃ 'শোন, আমাকে কোরআন দেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন হবে যে, কোন তৃপ্ত ও আরামপ্রিয় ব্যক্তি বলাবলি করবে যে, তোমাদের জন্যে কোরআনই যথেষ্ট। এতে যা হালাল করা হয়েছে তাকেই হালাল মনে কর এবং এতে যা হারাম করা হয়েছে তাকেই হারাম মনে কর। অথচ বাস্তব সত্য এই যে, আল্লাহ্র রসূল যা হারাম করেছেন, তাও আল্লাহ্র হারাম করা বস্তুর মতই হারাম।' --(আবু-দাউদ, ইবনে-মাজা দারেমী)।

**শরীয়তের বিধান তিন প্রকার ঃ** স্বয়ং কোরআনও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় ঃ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না। তিনি যাকিছু বলেন, সবই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলেন। যেসব ক্ষেত্রে তিনি কোন কথা স্বীয় ইজতেহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে বলেন এবং অতঃপর ওহীর মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে নির্দেশ অবতীর্ণ না হয়, পরিণামে সে ইজতেহাদও ওহীর মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

সারকথা এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) যেসব বিধান উম্মতকে দিয়েছেন, সেগুলো তিন প্রকার ঃ (এক) যেসব বিধান কোরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত রয়েছে, (দুই) যেসব বিধান সুস্পষ্টভাবে কোরআনে উল্লেখিত নাই; বরং পৃথক ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্র প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং (তিন) যেসব বিধান তিনি স্বয়ং ইজতেহাদ ও কিয়াসের মাধ্যমে দিয়েছেন এবং এর বিরুদ্ধে ওহীর মাধ্যমে কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হয়নি।

আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এতে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআন তিনটি গ্রন্থের নির্দেশাবলী পালন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অথচ এগুলোর একটি অপরটিকে রহিত করে দিয়েছে। ইঞ্জীল তওরাতের কতক বিধানকে এবং কোরআন তওরাত ও ইঞ্জীলের অনেক বিধানকে রহিত করেছে। এমতাবস্থায় তিনটির সমষ্টিকে পালন করা কিরূপে সম্ভবপর হবে?

এর জওয়াব সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, পরবর্তীকালে আগমনকারী গ্রন্থ পূর্ববর্তী গ্রন্থের যেসব বিধানকে পরিবর্তন করেছে, সেসব পরিবর্তিত বিধান পালন করাই উভয় গ্রন্থ পালন করার নামান্তর। রহিত বিধান পালন করা উভয় গ্রন্থের উদ্দেশ্যেরই পরিপন্থী।

**মহানবী (সাঃ)-এর প্রতি একটি সান্ত্বনা ঃ** উপসংহারে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সান্ত্বনার জন্যে বলা হয়েছে ঃ আহলে-কিতাবদের অনেকেই আমার দেয়া সুযোগ-সুবিধা ও অনুগ্রহের দ্বারা উপকৃত হবে না, বরং তাদের কুফর ও ঔদ্ধত্য আরও বেড়ে যাবে। অতএব, আপনি এতে দুঃখিত হবেন না এবং তাদের প্রতি অনুকম্পাশীলও হবেন না।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ
رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا
وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ
تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ
وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ
مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ
ثَلَاثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۚ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ
لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى
اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَانِ
الطَّعَامَ ۗ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾

*(৬৯) নিশ্চয় যারা মুসলমান, যারা ইহুদী, ছাবেয়ী বা খ্রীষ্টান, তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্‌র প্রতি, কিয়ামতের প্রতি এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (৭০) আমি বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে অনেক পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। যখনই তাদের কাছে কোন পয়গম্বর এমন নির্দেশ নিয়ে আসত যা তাদের মনে চাইত না, তখন তাদের অনেকের প্রতি তারা মিথ্যারোপ করত এবং অনেককে হত্যা করে ফেলত। (৭১) তারা ধারণা করেছে যে,কোন অনিষ্ট হবে না। ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের তওবা কবুল করলেন। এরপরও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধির হয়ে রইল। আল্লাহ্ দেখেন, তারা যা কিছু করে। (৭২) তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিয়ম-তনয় মসীহ্-ই আল্লাহ্; অথচ মসীহ্ বলেন, হে বনী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহ্‌র এবাদত কর, যিনি আমার পালন কর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ্ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৭৩) নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলে ঃ আল্লাহ্ তিনের এক ; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। (৭৪) তারা আল্লাহ্‌র কাছে তওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ্ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৭৫) মরিয়ম-তনয় মসীহ্ রাসুল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে অনেক রাসুল অতিক্রান্ত হয়েছেন আর তাঁর জননী একজন ওলী। তাঁরা উভয়েই খাদ্য ভক্ষণ করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্যে কিরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি, আবার দেখুন, তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে।*

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**চারটি সম্প্রদায়ের প্রতি পরকালে মুক্তির ওয়াদা ঃ** দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা চারটি সম্প্রদায়কে ঈমান ও সৎকর্মের প্রতি আহবান জানিয়ে সেজন্য পরকালে মুক্তির ওয়াদা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম সম্প্রদায় হচ্ছে الَّذِينَ آمَنُوا অর্থাৎ, মুসলমান। দ্বিতীয়তঃ وَالَّذِينَ هَادُوا অর্থাৎ, ইহুদী, তৃতীয়তঃ صابئون এবং চতুর্থত ঃ نصارى -এদের মধ্যে তিনটি জাতি, মুসলমান, ইহুদী ও খৃষ্টান সর্বজনপরিচিত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিদ্যমান। সাবিয়্যুন অথবা ছাবেয়ী নামে আজকাল পৃথিবীতে কোন প্রসিদ্ধ জাতি নাই। এ কারণেই এদের চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়।

তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর হযরত কাতাদার বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, সাবিয়্যুন হল তারাই যারা ফেরেশতাদের এবাদত করে, কেবলার উল্টোদিকে নামায পড়ে এবং দাউদ (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ যবুর পাঠ করে।

কোরআন পাকের এ বর্ণনাভঙ্গি থেকে বাহ্যতঃ এর সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা কোরআন মজীদে চারটি ঐশী গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে ঃ কোরআন, ইঞ্জীল, যবুর ও তওরাত। আয়াতে এ গ্রন্থ চতুষ্টয়ের অনুসারীদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

**আল্লাহ্ তাআলার কাছে সাফল্য সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল ঃ** উভয় আয়াতের মোটামুটি বিষয়বস্তু এই যে, আমার দরবারে কারও বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের কোন মূল্য নেই। যে ব্যক্তি পূর্ণ আনুগত্য, বিশ্বাস ও সৎকর্ম অবলম্বন করবে, সে পূর্বে যাই থাক, আমার কাছে প্রিয় বলে গণ্য হবে এবং তার কাজকর্ম গৃহীত হবে। একথা সুস্পষ্ট যে, কোরআন অবতরণের পর পূর্ণ আনুগত্য মুসলমান হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কারণ, পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত এবং ইঞ্জীলেও এরই নির্দেশ রয়েছে। কারআন পাক শুধুমাত্র এ উদ্দেশেই অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণেই কোরআন অবতরণ ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুরের অনুসরণ বিশুদ্ধ হতে পারে না। অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা মুসলমান হবে, তারাই পরকালে মুক্তি ও ছোয়াবের অধিকারী হবে। এতে এ ধারণাও খণ্ডন করা হয়েছে যে, এরা কুফর ও পাপের পথে থেকে এযাবৎ ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব হীন চক্রান্ত করেছে, মুসলমান হওয়ার পর এদের পরিণাম কি হবে? আয়াতদৃষ্টে বোঝা যাচ্ছে যে, অতীত সব গোনাহ্ ও ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা হবে এবং পরকালে তারা শঙ্কিত ও দুঃখিত হবে না।

বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, এখানে মুসলমানদের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কেননা, আয়াতে যে স্তরের ঈমান ও আনুগত্য কামনা করা হয়েছে, তারা পূর্ব থেকেই সে স্তরে বিরাজমান। এ স্তরের প্রতি যাদেরকে ডাকা উদ্দেশ্য, আয়াতে শুধু তাদের উল্লেখ করাই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাদের সাথে মুসলমানদের যুক্ত করার ফলে একটি বিশেষ ভাষালঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বোঝা যাবে। কোন শাসনকর্তা অথবা বাদশাহ্ এরূপ স্থলে বলে থাকেন ঃ আমাদের আইন সবার বেলায় প্রযোজ্য, অনুগত হোক কিংবা বিরোধী যে-ই আনুগত্য করবে, সেই অনুগ্রহ ও পুরস্কারের যোগ্য হবে। এখন সবারই

জানা যে, অনুগতরা তো আনুগত্য করছেই— যে বিরোধী আসলে তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে অনুগতকে উল্লেখ করার তাৎপর্য এই যে, অনুগতদের প্রতি আমাদের যে কৃপাদৃষ্টি, তা কোন বংশগত ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের আনুগত্যের উপরই নির্ভরশীল। যদি বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিও আনুগত্য অবলম্বন করে, তবে সেও এ কৃপা ও অনুগ্রহের অধিকারী হবে।

উপরোক্ত চার সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা তিনটি অংশে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস এবং সৎকর্ম।

**রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই ঃ** এ আয়াতে ঈমান ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় সব বিষয়ের বিবরণ পেশ করা লক্ষ্য নয়। ইসলামের কয়েকটি মৌলিক বিশ্বাস উল্লেখ করে সব বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত করা এবং তৎপ্রতি আহবান জানানোই এখানে উদ্দেশ্য। নতুবা যে আয়াতেই ঈমানের উল্লেখ করা হবে, সেখানেই ঈমানের আদ্যোপান্ত বিবরণ উল্লেখ করতে হবে। অথচ এমনটি অপরিহার্য হতে পারে না। তাই এক্ষেত্রেও রসূল অথবা রেসালতের প্রতি বিশ্বাসের কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখিত না হওয়ায় কোন সামান্যতম জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও কোনরূপ সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না। বিশেষ করে যখন সমগ্র কোরআন ও তার শত শত আয়াত রেসালতের প্রতি বিশ্বাসের স্পষ্টোক্তিতে পরিপূর্ণ রয়েছে। এসব আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রসূল ও রসূলের বাণীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত মুক্তি নেই এবং এ বিশ্বাস ছাড়া কোন ঈমান ও সৎকর্মই গ্রহণীয় নয়। কিন্তু একটি ধর্মদ্রোহী দল কোন না কোন উপায়ে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ কোরআনের অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে পরিষ্কারভাবে রেসালত উল্লেখিত না হওয়ায় তারা একটি নতুন মতবাদ খাড়া করেছে, যা কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য স্পষ্টোক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। তা এই যে, প্রত্যেক বিজ্ঞ লোক তা ইহুদী, খ্রীষ্টান এমন কি মূর্তিপূজারী পৌত্তলিক থাকা অবস্থায়ও যদি শুধু আল্লাহ্ ও কেয়ামতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তবে পরকালে মুক্তির অধিকারী হতে পারে— পারলৌকিক মুক্তির জন্যে ইসলাম গ্রহণ করা কোন জরুরী বিষয় নয়।—(নাউযুবিল্লাহ)

আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে কোরআন পাঠের শক্তি এবং কোরআনের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান দান করেছেন, তাদের পক্ষে কোরআনী স্পষ্টোক্তি দ্বারা এ বিভ্রান্তি দূর করা খুব বেশী বিদ্যা-বুদ্ধির মুখাপেক্ষী নয়। যারা কোরআনের অনুবাদ জানে তারাও এ কাল্পনিক ভ্রান্তি অনায়াসে বুঝতে পারে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ "আজ যদি মুসা (আঃ) জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর গতি ছিল না।"

অতএব, প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম পালন করে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করেই এবং মুসলমান না হয়েই পরকালে মুক্তি পাবে-এরূপ বলা কোরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ নয় কি?

**বনী-ইসরাঈলের অঙ্গীকার ভঙ্গঃ** كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰٓى أَنْفُسُهُمْ অর্থাৎ, বনী-ইসরাঈলের কাছে তাদের রসূল যখন কোন নির্দেশ নিয়ে আসতেন যা তাদের রুচিবিরুদ্ধ হত, তখন অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করত এবং পয়গম্বরদের মধ্যে কারো প্রতি মিথ্যারোপ করত এবং কাউকে হত্যা করত। এটি ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা। এখন পরকালের প্রতি বিশ্বাসের অবস্থা এ দ্বারা অনুমান করা যায় যে, এতসব নির্মম অত্যাচার ও বিদ্রোহীসুলভ অপরাধে লিপ্ত হয়েও তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকত। ভাবখানা এই যে, এসব কুকর্মের কোন সাজাই ভোগ করতে হবে না এবং নির্যাতন ও বিদ্রোহের অশুভ পরিণতি কখনও সামনে আসবে না। এহেন ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা খোদায়ী নিদর্শন ও হুশিয়ারী থেকে সম্পূর্ণ অন্ধ ও বধির হয়ে যায় এবং যা গর্হিত তাই করতে থাকে। এমনকি, কতক পয়গম্বরকে তারা হত্যা করে এবং কতককে বন্দী করে। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা বাদশাহ বখতে-নসরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। অতঃপর দীর্ঘদিন অতীত হলে জনৈক পারস্য সম্রাট তাদেরকে বখতে-নসরের লাঞ্ছনা ও অবমাননার কবল থেকে উদ্ধার করে বাবেল থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাসে আনেন। তখন তারা তওবা করে এবং অবস্থা সংশোধনে মনোনিবেশ করে। আল্লাহ্ তাদের সে তওবা কবুল করেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা আবার দুষ্কৃতিতে মেতে উঠে এবং অন্ধ ও বধির হয়ে হযরত যাকারিয়া ও হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে হত্যা করার দুঃসাহস প্রদর্শন করে। তারা হযরত ঈসা (আঃ)-কেও হত্যা করতে উদ্যত হয়।—(ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

..... لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا অর্থাৎ, হযরত মসীহ, রূহুল কুদুস ও আল্লাহ্ কিংবা মসীহ্, মরিয়ম ও আল্লাহ্ সবাই আল্লাহ্ -(নাউযুবিল্লাহ)। তাদের মধ্যে একজন অংশীদার হলেন আল্লাহ্। এরপর তাঁরা তিন জনই এক এবং একজনই তিন। এ হচ্ছে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্মবিশ্বাস। এ যুক্তিবিরোধী ধর্মবিশ্বাসকে তারা জটিল ও দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় ব্যক্ত করে। অতঃপর বিষয়টি যখন কারও বোধগম্য হয় না, তখন একে 'বুদ্ধি বহির্ভূত সত্য' বলে আখ্যা দিয়ে ক্ষান্ত হয়।— (ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

**মসীহ্ (আঃ)-এর উপাস্যতা খণ্ডন ঃ** قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ অর্থাৎ, অন্যান্য পয়গম্বর যেমন পৃথিবীতে আগমন করার পর কিছুদিন অবস্থান করে এখান থেকে লোকান্তরিত হয়ে গেছেন এবং স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেননি যা উপাস্য হওয়ার লক্ষণ, এমনিভাবে হযরত মসীহ্ (আঃ) যিনি তাঁদের মতই একজন মানুষ—স্থায়িত্ব ও অমরত্ব লাভ করতে পারেননি। কাজেই তিনি উপাস্য হতে পারেন না।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে, যে ব্যক্তি পানাহারের মুখাপেক্ষী, সে পৃথিবীর সব কিছুরই মুখাপেক্ষী। মাটি বাতাস, পানি, সূর্য এবং জীবজন্তু থেকে সে পরাঙ্মুখ হতে পারে না। খাদ্যশস্য উদরে পৌঁছা এবং হজম হওয়া পর্যন্ত চিন্তা করুন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কতকিছু প্রয়োজন। এরপর খাওয়ার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা কতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে। পরমুখাপেক্ষিতার এ দীর্ঘ পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা মসীহ্ ও মরিয়মের উপাস্যতা খণ্ডনকল্পে যুক্তির আকারে এরূপ বলতে পারি ঃ মসীহ্ ও মরিয়ম পানাহারের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র থেকে মুক্ত ছিলেন না। এ বিষয়টি চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও লোকপরম্পরা দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি পানাহার থেকে মুক্ত নয়, সে পৃথিবীর কোন বস্তু থেকেই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে না। এখন আপনিই বলুন, যে সত্তা মানব-মণ্ডলীর মত স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার্থ বস্তুজগত থেকে পরাঙ্মুখ নয়, সে কিভাবে আল্লাহ্ হতে পারে? এ শক্তিশালী ও সুস্পষ্ট যুক্তিটি জ্ঞানী ও মূর্খ সবাই সমভাবে বুঝতে পারে। অর্থাৎ, পানাহার করা উপাস্য হওয়ার পরিপন্থী—যদিও পানাহার না করাও উপাস্য হওয়ার প্রমাণ নয়। নতুবা সব ফেরেশতা আল্লাহ্ হয়ে যাবে।— (ফাওয়ায়েদে ওসমানী)।

قُلْ اَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا
وَاللّٰهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ
دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْۤا اَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ
قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ ﴿٧٧﴾ لُعِنَ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ؕ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾ كَانُوْا لَا
يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿٧٩﴾
تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ
لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ
خٰلِدُوْنَ ﴿٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوْا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاۤ اُنْزِلَ
اِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَآءَ وَلٰكِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ
فٰسِقُوْنَ ﴿٨١﴾ لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا
الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً
لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّا نَصٰرٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّ
مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

*(৭৬) বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুর এবাদত কর, যে তোমাদের অপকার বা উপকার করার ক্ষমতা রাখে না? অথচ আল্লাহ্ সব শুনেন, জানেন।*

*(৭৭) বলুনঃ হে আহলে-কিতাবগণ, তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং এতে ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। (৭৮) বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লঙ্ঘন করত। (৭৯) তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। (৮০) আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্যে যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। (৮১) যদি তারা আল্লাহ্র প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার। (৮২) আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন এবং আপনি সবার চাইতে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী তাদেরকে পাবেন, যারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টান বলে। এর কারণ এই যে, খ্রীষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহঙ্কার করে না।*

**হযরত মরিয়ম পয়গম্বর ছিলেন কি ওলী ঃ** হযরত মরিয়মের পয়গম্বর ও ওলী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে প্রশংসার স্থলে صديقة শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, তিনি ওলী ছিলেন— নবী নয়। কারণ, প্রশংসার স্থলে সাধারণতঃ উচ্চপদই উল্লেখ করা হয়। নবুওয়ত প্রাপ্ত হয়ে থাকলে এখানে نبية বলা হত। অথচ বলা হয়েছে صديقة এটি ওলীত্বের একটি স্তর। — (রুহুল মাআনী, সংক্ষেপিত)

আলেমদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, মহিলারা কখনও নবুওয়ত লাভ করেনি। এ পদ সর্বদা পুরুষদের জন্যেই সংরক্ষিত রয়েছে।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**বনী-ইসরাঈলের কুটিলতার আরেকটি দিক ঃ** قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বনী-ইসরাঈলের ঔদ্ধত্য ও তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন বর্ণনা করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্ প্রেরিত রসূল-যারা তাদের অক্ষয় জীবনের বার্তা ও তাদের ইহকাল ও পরকাল সংশোধনের কার্যবিধি নিয়ে আগমন করেছিলেন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পরিবর্তে তারা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে فَرِيْقًا كَذَّبُوْا وَفَرِيْقًا يَقْتُلُوْنَ অর্থাৎ, কতক পয়গম্বরকে তারা মিথ্যারোপ করে এবং কতককে হত্যা করে ফেলে

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব বনী-ইসরাঈলেরই কুটিলতার আরেকটি দিক ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মূর্খরা যেমন ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার এক প্রান্তে থেকে আল্লাহ্র পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং কতককে হত্যা করেছে, তেমনি এরাই বক্রতার অপর প্রান্তে পৌঁছে পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে আল্লাহ্তে পরিণত করে দিয়েছে, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ – অর্থাৎ, যে সব বনী-ইসরাঈল বলে যে, আল্লাহ্ তো ঈসা ইবনে মরিয়মেরই নাম, তারা কাফের হয়ে গেছে।

এখানে এ উক্তিটি শুধু খ্রীষ্টানদের বলে বর্ণিত হয়েছে। অন্যত্র একই ধরনের বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা ইহুদীদের ব্যাপারেও বর্ণনা করা হয়েছে

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ

অর্থাৎ, ইহুদীরা বলে যে, হযরত ওযায়র আল্লাহ্র পুত্র এবং খ্রীষ্টানরা বলে যে, মসীহ্ আল্লাহ্র পুত্র।

غلو শব্দের অর্থ সীমা অতিক্রম করা। ধর্মের সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম যে সীমা নির্ধারণ করেছে, তা লঙ্ঘন করা।

উদাহরণতঃ পয়গম্বরদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সীমা এই যে, আল্লাহ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে তাঁদেরকে সর্বোত্তম মনে করতে হবে। এ সীমা অতিক্রম করে তাদেরকে আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্র পুত্র বলে দেয়া হচ্ছে বিশ্বাসগত সীমা লঙ্ঘন।

**বনী-ইসরাঈলের বাড়াবাড়ি ঃ** পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করা এবং হত্যা করতেও কুণ্ঠিত না হওয়া, অথবা তাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ কিংবা আল্লাহ্র পুত্র বলে দেয়া, বনী -ইসরাঈলের এ পরস্পর বিরোধী দু'টি

রয়েছে মূর্খতাপ্রসূত বাড়াবাড়ি। আরবের প্রসিদ্ধ প্রবচন হচ্ছে ঃ الجاهل اما مفرط او مفرط অর্থাৎ, মূর্খ ব্যক্তি কখনও মিতাচার ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারে না। সে হয় বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, না হয় সীমালঙ্ঘনে। এ বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন বনী-ইসরাঈলের দু'টি ভিন্ন দলের পক্ষ থেকে হয়ে থাকতে পারে এবং এমনও হতে পারে যে, একদল লোকই দু'টি ভিন্নমুখী কর্ম বিভিন্ন পয়গম্বরদের সাথে করেছে। অর্থাৎ, কারো কারো প্রতি মিথ্যারোপ করে হত্যা করেছে এবং কাউকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য করে দিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আহলে-কিতাবদেরকে সম্বোধন করে যে সব নির্দেশ তাদেরকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী বংশধরকে দেয়া হয়েছে, তা ধর্ম অনুসরণের ক্ষেত্রে একটি মূল স্তম্ভ বিশেষ। এ মূলনীতি থেকে সামান্য এ দিক –সেদিক হলেই মানুষ পথভ্রষ্টতার আবর্তে পতিত হয়ে যায়। এ কারণে এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

**আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার পথ ঃ** এটা বাস্তব সত্য যে, সমগ্র দুনিয়া-জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা। সমগ্র বিশ্বে তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই নির্দেশ চালু। তাঁরই আনুগত্য করা প্রতিটি মানবের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু বেচারী মাটির মানুষ মৃত্তিকাজনিত তমসা ও অধোগতির দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে। সে আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তা এবং তাঁর বিধান ও নির্দেশাবলী শত চেষ্টা করেও জানতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কৃপায় তার জন্যে দু'টি মাধ্যম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ মাধ্যমদ্বয়ের দ্বারা সে আল্লাহ্ তাআলার পছন্দ-অপছন্দ এবং আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের জ্ঞান লাভ করতে পারে। তন্মধ্যে একটি মাধ্যম হচ্ছে ঐশীগ্রন্থ, যা মানুষের জন্যে আইন ও নির্দেশনামাবিশেষ। দ্বিতীয় মাধ্যম হচ্ছে মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দা। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে স্বীয় পছন্দ ও অপছন্দের বাস্তব নমুনা এবং স্বীয় গ্রন্থের বাস্তব ব্যাখ্যাতা রূপে পাঠিয়েছেন। ধর্মীয় পরিভাষায় তাঁদেরকে রসূল কিংবা নবী বলা হয়। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, কোন গ্রন্থ-তা যতই সর্ব বিষয় সমন্বিত ও বিস্তারিত হোক না কেন, মানুষের সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে যথেষ্ট হয় না। বরং স্বভাবগতভাবেই মানুষের প্রশিক্ষক ও সংস্কারক একমাত্র মানুষই হতে পারে। তাই আল্লাহ্ তাআলা মানুষের সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার জন্যে দু'টি উপায় রেখেছেন ঃ আল্লাহ্‌র গ্রন্থ এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার জামাত। পয়গম্বরগণ, তাঁদের উত্তরসূরি আলেম ও মাশায়েখ-এঁরা সবাই এ মানব মন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌র প্রিয় এসব মানুষের সম্মানের হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রাচীনকাল থেকেই বিশ্ববাসী বাড়াবাড়ির ভুলে লিপ্ত রয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যেসব দল-উপদল সৃষ্টি হয়েছে, সে সবই এ ভুলের ফসল। কোথাও তাদেরকে সীমা ডিঙ্গিয়ে ব্যক্তিপূজার স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়েছে এবং কোথাও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে حسبنا كتاب الله – বাক্যটিকে ভুল অর্থ পরিয়ে দেয়া হয়েছে। একদিকে রসূলকে বরং পীরদেরকেও 'আলেমুল গায়ব' এবং খোদায়ী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মনে করে নেয়া হয়েছে এবং পীর পূজা বরং কবরপূজা আরম্ভ হয়েছে, অপরদিকে আল্লাহ্‌র রসূলকে শুধু একজন পত্রবাহকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে পয়গম্বরদের অবমাননাকারীদেরকে যেমন কাফের বলা হয়েছে, তেমনি তাঁদেরকে সীমা ছাড়িয়ে আল্লাহ্‌র সমতুল্য আখ্যাদানকারীদেরকেও কাফের সাব্যস্ত করা হয়েছে। لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ –আয়াতখানি এ বিষয়বস্তুরই ভূমিকা। এতে ফুটে উঠেছে যে, ধর্ম প্রকৃতপক্ষে কতগুলো সীমা ও প্রতিবন্ধককেই বলা হয়। এ সীমার ভিতরে ত্রুটি করা যেমন অপরাধ, তেমনি এ সীমাকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়াও অন্যায়। রসূল ও তাঁদের উত্তরসূরিদের কথা অমান্য করা এবং তাঁদের অবমাননা করা যেমন মহাপাপ, তেমনি তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ গুণাবলীর অধিকারী মনে করা আরও গুরুতর অপরাধ।

**শিক্ষাগত তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণ বাড়াবাড়ি নয় ঃ** আলোচ্য আয়াতে لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ – বলার সাথে সাথে غَيْرَ الْحَقِّ বলা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। সূক্ষ্মদর্শী তফসীরবিদদের মতে এ শব্দটি তাকীদ অর্থাৎ, বিষয়বস্তুকে জোরদার করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, ধর্মে বাড়াবাড়ি সর্বাবস্থায়ই অন্যায়। এটা ন্যায় হওয়ার কোন সম্ভবনাই নেই। আল্লামা যমখশরী প্রমুখ তফসীরবিদগণ, এ স্থলে বাড়াবাড়িকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি অন্যায় ও অসত্য, যা আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অপরটি ন্যায় ও বৈধ। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁরা শিক্ষাগত তথ্যানুন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণকে উপস্থিত করেছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কিত মাসআলায় মুসলিম দার্শনিকগণ এবং ফেকাহ্ সংক্রান্ত মাসআলায় ফেকাহ্‌বিদগণ এরূপ তথ্যানুসন্ধান করেছেন। উপরোক্ত তফসীরবিদগণের মতে এগুলোও বাড়াবাড়ি ; তবে ন্যায় ও বৈধ। সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেন ঃ এগুলো আদৌ বাড়াবাড়ি নয়। কোরআন ও সুন্নাহ্‌র মাসআলায় যতটুকু তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ রসূলে-করীম (সাঃ), সাহাবী ও তাবেয়ীগণ থেকে প্রমাণিত রয়েছে, ততটুকু বাড়াবাড়ি নয় এবং যা বাড়াবাড়ির সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তা এ ক্ষেত্রেও নিন্দনীয়।

**বনী-ইসরাঈলকে মধ্যবর্তী পথ অবলম্বনের নির্দেশ ঃ** আলোচ্য আয়াতের শেষভাগে বর্তমান কালের বনী-ইসরাঈলদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে–

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا —অর্থাৎ, ঐ সম্প্রদায়ের অনুসরণ করো না, যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছিল এবং অপরকেও পথভ্রষ্ট করেছিল। অতঃপর তাদের পথভ্রষ্টতার স্বরূপ ও কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছেঃ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ —অর্থাৎ, তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, যা ছিল বাড়াবাড়ি ও ত্রুটির মাঝখানে মধ্যবর্তী পথ। এভাবে এ আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটি যে, একটি মারাত্মক ভ্রান্তি, তা এবং সরল পথে কায়েম থাকার কথাও বর্ণিত হয়েছে।

**বনী-ইসরাঈলের কু-পরিণাম ঃ** দ্বিতীয় আয়াতে বাড়াবাড়ি ও ত্রুটিজনিত পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত বনী-ইসরাঈলের কুপরিণাম বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে- প্রথমতঃ হযরত দাউদ (আঃ)-এর মুখে, যার ফলে তাদের আকার-আকৃতি বিকৃতি হয়ে শূকরে পরিণত হয়। অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর বাচনিক এ অভিসম্পাত তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়। এর জাগতিক প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, তারা বিকৃত হয়ে বানরে পরিণত হয়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন যে, এস্থলে স্থানোপযোগিতার কারণে মাত্র দু'জন পয়গম্বরের বাচনিক তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তাদের উপর অভিসম্পাতের সূচনা হযরত মূসা (আঃ) থেকে হয়েছিল এবং তা সমাপ্ত হয়েছে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাচনিক। এভাবে উপর্যুপরি চারজন পয়গম্বরের বাচনিক তাদের উপর অভিসম্পাত

বর্ষিত হয়েছে, যারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিংবা তাঁদেরকে সীমা ডিঙ্গিয়ে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলীতে অংশীদার করেছিল।

সর্বশেষ দু'আয়াতে কাফেরদের সাথে গভীর বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং এর মারাত্মক পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এতে এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, বনী-ইসরাঈলের সব বক্রতা ও পথভ্রষ্টতা তাদের ভ্রান্ত পরিবেশ ও কাফেরদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্বেরই ফলশ্রুতি ছিল, যা তাদেরকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিল।

**কতিপয় আহ্লে-কিতাবের সত্যানুরাগ ঃ** আলোচ্য আয়াতসমূহে মুসলমানদের সাথে শত্রুতা ও বন্ধুত্বের মাপকাঠিতে ঐসব আহ্লে-কিতাবের কথা আলোচনা করা হয়েছে, যারা সত্যানুরাগ ও খোদাভিরুতার কারণে মুসলমানদের প্রতি হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করত না। কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে এ জাতীয় লোকের সংখ্যা ছিল নেহায়েতই নগণ্য। উদাহরণতঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ। খ্রীষ্টানদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল বেশী। বিশেষতঃ মহানবী (সাঃ)-এর আমলে আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এ কারণেই মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমানরা কোরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদেরকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেন এবং বলেন ঃ আমি শুনেছি আবিসিনিয়ার সম্রাট কারও প্রতি জুলুম করেন না এবং কাউকে জুলুম করতে দেন না। তাই মুসলমানরা কিছুদিনের জন্যে সেখানে চলে যেতে পারে।

পরামর্শ অনুযায়ী প্রথমবার এগার জনের একটি দল আবিসিনিয়ায় চলে যায়। তাদের মধ্যে হযরত ওসমান গনী (রাঃ) এবং তাঁর স্ত্রী নবী-দুহিতা হযরত রোকাইয়া (রাঃ)-ও ছিলেন। এরপর হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেবের নেতৃত্বে একটি বিরাট কাফেলা আবিসিনিয়ায় গিয়ে পৌঁছে। এ কাফেলায় পুরুষ ছিলেন বিরাশি জন। আবিসিনিয়ার অধিবাসিরা তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানায় এবং তারা তথায় সুখে-শান্তিতে বাস করতে থাকেন।

কিন্তু মুসলমানরা অন্য কোন দেশে গিয়ে শান্তিতে জীবন যাপন করবে, মক্কার ক্রোধান্ধ কাফেরকুলের তাও সহ্য হল না। তারা প্রচুর উপঢৌকনসহ একটি প্রতিনিধিদল আবিসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দিল এবং মুসলমানদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করল। কিন্তু সম্রাট প্রকৃত অবস্থা তদন্ত করলেন এবং হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে ইসলাম ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অবগত হলেন। এসব তথ্য ও ইসলামী শিক্ষাকে তিনি হযরত ঈসা (আঃ) ও ইঞ্জীলের ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ অনুরূপ পেলেন। বলাবাহুল্য, ভবিষ্যদ্বাণীতে মহানবী (সাঃ)-এর আবির্ভাব, তাঁর শিক্ষার সংক্ষিপ্ত চিত্র, তাঁর ও তাঁর সহচরবর্গের দৈহিক আকার-আকৃতি ইত্যাদিও বর্ণিত হয়েছিল। এতে প্রভাবান্বিত হয়ে সম্রাট কোরাইশী প্রতিনিধি দলের সব উপঢৌকন ফেরৎ দিলেন এবং তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিলেন যে, আমি এমন লোকদেরকে কখনও দেশ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারি না।

**জা'ফর ইবনে আবু তালেবের বক্তৃতার প্রভাব ঃ** হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার একটি সংক্ষিপ্ত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এছাড়া সেখানে তাঁদের বসবাসের ফলেও সম্রাট, রাজকর্মচারী ও জনগণের অন্তরে ইসলামের প্রতি অগাধ ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করার পর যখন সাহাবীদের নিয়ে নিরাপদে কালাতিপাত করতে থাকেন, তখন আবিসিনিয়ার মুহাজিরগণ মদীনা যাওয়ার সঙ্কল্প করেন। এ সময় ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ সম্রাট নাজ্জাশী তাঁদের সাথে প্রধান প্রধান খ্রীস্টান আলেম ও মাশায়েখের একটি প্রতিনিধিদল মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে পাঠিয়ে দিলেন। সত্তর জনের এ প্রতিনিধিদলে বাষট্টি জন আবিসিনিয় ও আট জন সিরীয় আলেম ও মাশায়েখ ছিলেন।

**নবীর দরবারে শাহী প্রতিনিধিদলের উপস্থিতি ঃ** প্রতিনিধিদলটি সংসারত্যাগী দরবেশসুলভ পোশাক পরিহিত হয়ে দরবারে উপস্থিত হলে মহানবী (সাঃ) তাদেরকে সূরা-ইয়াসীন পাঠ করে শুনালেন। কোরআন পাঠ শুনে তাদের চোখ থেকে অবিরাম অশ্রু ঝরছিল। তারা শ্রদ্ধাপূত কণ্ঠে বললেন ঃ এ কালাম হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কালামের সাথে কতই না গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতঃপর প্রতিনিধিদলের সবাই মুসলমান হয়ে গেলেন।

তাদের প্রত্যাবর্তনের পর সম্রাট নাজ্জাশীও ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন এবং একখানা চিঠি লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে অপর একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় পাঠালেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে জাহাজ ডুবির ফলে তারা সবাই প্রাণত্যাগ করল। মোটকথা, আবিসিনিয়ার সম্রাট, রাজ কর্মচারী ও জনগণ ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে শুধু ভদ্র ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং পরিশেষে তারা নিজেরাও মুসলমান হয়ে যান।

তফসীরবিদগণের মতে উল্লেখিত আয়াতসমূহ তাঁদের সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ - এবং পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্র ভয়ে তাদের ক্রন্দন করা এবং সত্যকে গ্রহণ করার কথা বর্ণিত হয়েছে। তফসীরবিদগণ এ বিষয়েও একমত যে, যদিও আলোচ্য আয়াতসমূহ সম্রাট নাজ্জাশী ও তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধিদল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্ত্বেও ভাষার ব্যাপকতার দরুন অন্যান্য ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ খ্রীস্টানদের বেলায়ও এ আয়াত প্রযোজ্য। অর্থাৎ, যারা ইসলাম পূর্বকালে ইঞ্জীলের অনুসারী ছিল এবং ইসলামোত্তর কালে ইসলামের অনুসারী হয়ে গেছে।

ইহুদীদের মধ্যেও এ ধরনের কয়েকজন ছিলেন যারা পূর্বে তওরাতের অনুসরণ করতেন এবং ইসলাম আসার পর ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা জাতিসমূহের আলোচনায় অনুল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম ছিল। অবশিষ্ট ইহুদীদের অবস্থা সবারই জ্ঞাত ছিল যে, তারা মুসলমানদের শত্রুতা ও মূলোৎপাটনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করত। তাই আয়াতের শুরুভাগে ইহুদীদের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ—অর্থাৎ, মুসলমানদের প্রতি শত্রুতায় ইহুদীরাই সর্বাধিক কঠোর।

মোটকথা, এ আয়াতে খ্রীস্টানদের একটি বিশেষ দলের গুণকীর্তন করা হয়েছে, যারা ছিল খোদাভীরু ও সত্য প্রিয়। নাজ্জাশী ও তাঁর পারিষদবর্গও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য যেসব খ্রীস্টান এসব গুণের বাহক ছিল কিংবা ভবিষ্যতে হবে, তারাও এ দলেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু আয়াতের অর্থ এই নয় এবং হতেও পারে না যে, খ্রীস্টান জাতি যতই পথভ্রষ্ট হোক না কেন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যতই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ
تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ
الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿٨٤﴾
فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿٨٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَ
اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

*(৮৩) আর তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শুনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রু সজল দেখতে পাবেন; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন। (৮৪) আমাদের কি ওযর থাকতে পারে যে, আমরা আল্লাহ্‌র প্রতি এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে, তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব না এবং এ আশা করবো না যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে সৎ লোকদের সাথে প্রবিষ্ট করবেন? (৮৫) অতঃপর তাদেরকে আল্লাহ্ এ উক্তির প্রতিদানস্বরূপ এমন উদ্যান দিবেন যার তলদেশে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তন্মধ্যে চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান। (৮৬) যারা কাফের হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা বলেছে, তারাই দোযখী। (৮৭) হে মু'মিনগণ, তোমরা ঐসব সুস্বাদু বস্তু হারাম করো না, যেগুলো আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে হালাল করেছেন এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (৮৮) আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তন্মধ্য থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী। (৮৯) আল্লাহ্ তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্যে; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্যে যা তোমরা মজবুত করে বাধ। অতএব, এর কাফ্‌ফারা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা, তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা, একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটা কাফ্‌ফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।*

করুক না কেন সর্বাবস্থায়ই তাদেরকে মুসলমানদের বন্ধু ও হিতৈষী বলে মনে করতে হবে এবং মুসলমানরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করবে। কেননা, এমন অর্থ করাও নির্জলা ভুল এবং ঘটনাবলীর পরিপন্থী। তাই ইমাম আবু বকর জাসসাস আহকামুল কোরআনে বলেন ঃ কিছু সংখ্যক অজ্ঞ লোকের ধারণা এই যে, এসব আয়াতে সর্বাবস্থায় খ্রীস্টানদের প্রশংসা কীর্তন করা হয়েছে এবং তারা সর্বতোভাবে ইহুদীদের চাইতে উত্তম। এটি নিরেট মূর্খতা। কারণ, সাধারণভাবে উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস যাচাই করলে দেখা যায়, খ্রীস্টানদের মুশরিক হওয়াই অধিক সুস্পষ্ট। মুসলমানদের সাথে কাজ-কারবার পরীক্ষা করলে দেখা যায়, বর্তমান কালের সাধারণ খ্রীস্টানরাও ইসলাম বিদ্বেষে ইহুদীদের চাইতে পিছিয়ে নেই। তবে এ কথা সত্য যে, এক সময় খ্রীস্টানদের মধ্যে খোদাভীরু ও সত্যপ্রিয় লোকদের প্রাচুর্য ছিল। ফলে তারা ইসলাম গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। আলোচ্য আয়াত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। স্বয়ং এ আয়াতের শেষভাগে কোরআন এ সত্য বর্ণনা করে বলেছে ঃ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ অর্থাৎ, এসব আয়াতে খ্রীস্টানদলের প্রশংসা করার কারণ এই যে, তাদের মধ্যে আলেম, সংসারত্যাগী ও খোদাভীরু ব্যক্তিবর্গ রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অহঙ্কার নাই যে, অন্যের কথা শুনতে সম্মত হবে না। এতে বোঝা গেল যে, ইহুদীদের অবস্থা এমন ছিল না। তারা খোদাভীরু ও সত্যপ্রিয় ছিল না। তাদের আলেমরাও সংসারত্যাগের পরিবর্তে স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধিকে শুধু জীবিকা-উপার্জনে নিয়োজিত করেছিল এবং সংসারের প্রতি এমন মোহবিষ্ট ছিল যে, সত্যাসত্য ও হালাল-হারামের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করত না।

**সত্যানুরাগী আলেম ও মাশায়েখই জাতির প্রাণকেন্দ্র ঃ** আলোচ্য আয়াত থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেল যে, সত্যানুরাগী খোদাভীরু আলেম ও মাশায়েখই জাতির আসল প্রাণকেন্দ্র। তাদের অস্তিত্বের মধ্যেই সমগ্র জাতির জীবন নিহিত। যতদিন কোন জাতির মধ্যে এমন আলেম ও মাশায়েখ বিদ্যমান থাকেন, যারা পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী নয় এবং যারা খোদাভীরু, ততদিন সে জাতি অব্যাহতভাবে কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে থাকে।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**সংসার ত্যাগ খোদায়ী সীমার ভিতরে হলে বৈধ, নতুবা হারাম ঃ** উল্লেখিত আয়াতসমূহে বলা হয়েছে যে, সংসার ত্যাগ ও ভোগ-বিলাস ত্যাগ করা যদিও এক পর্যায়ে প্রশংসনীয়, কিন্তু এতেও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা নিন্দনীয় ও হারাম। এর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

**হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার তিনটি স্তর ঃ** কোন হালাল বস্তুকে হারাম করে নেয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। (এক) বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে করে নেয়া, (দুই) উক্তির মাধ্যমে কোন বস্তুকে নিজের জন্যে হারাম করে নেয়া। উদাহরণতঃ এরূপ প্রতিজ্ঞা করা যে, ঠান্ডা পানি পান করবে না কিংবা অমুক হালাল খাদ্য খাবে না অথবা অমুক জায়েয কাজ করবে না এবং (তিন) বিশ্বাস ও উক্তি কিছুই নয় কিন্তু কার্যতঃ কোন হালাল বস্তুকে চিরতরে বর্জন করার সংকল্প করে নেয়া।

প্রথমাবস্থায় যদি ঐ বস্তু অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে হালাল হয়ে থাকে, তবে তাকে হারাম বলে যে লোক বিশ্বাস করবে সে আল্লাহ্‌র আইনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণের কারণে কাফের হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়াবস্থায় যদি কসমের শব্দ যোগে হালাল বস্তুটিকে নিজের উপর হারাম করে থাকে, তবে কসম শুদ্ধ হবে। কসমের শব্দ অনেক, যা ফেকাহ্ গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখিত রয়েছে। উদাহরণতঃ কেউ এরূপ বলে যে, আমি আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি, অমুক বস্তু খাব না কিংবা অমুক কাজ করব না অথবা এরূপ বলে যে, আমি অমুক বস্তু কিংবা অমুক কাজকে নিজের উপর হারাম করছি। বিনা প্রয়োজনে এরূপ কসম খাওয়া গোনাহ্। কিন্তু এরূপ কসম ভঙ্গ করলে তার কাফ্ফারা দেয়া জরুরী। কাফ্ফারার বিবরণ পরে বর্ণিত হবে।

তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ, বিশ্বাস ও উক্তি দ্বারা কোন হালালকে হারাম না করে কার্যতঃ হারামের মত ব্যবহার করলে যদি এরূপ বর্জনকে ছোয়াবের কাজ মনে করে, তবে তা বেদআত এবং বৈরাগ্য বা সংসারত্যাগ। এরূপ বৈরাগ্য যে মহাপাপ তা কোরআনের স্পষ্ট আয়াতে বর্ণিত আছে। এর বিরুদ্ধাচরণ করা ওয়াজেব এবং এরূপ বিধিনিষেধে অটল থাকা গোনাহ্। তবে এরূপ বিধিনিষেধ ছোয়াবের নিয়তে না হয়ে অন্য কোন কারণে যথা, কোন দৈহিক কিংবা আত্মিক অসুস্থতার কারণে কোন বিশেষ বস্তুকে স্থায়ীভাবে বর্জন করলে তাতে গোনাহ্ নেই। কোন কোন সুফী-বুযুর্গ হালাল বস্তু স্থায়ীভাবে বর্জন করেছেন বলে যেসব ঘটনা বর্ণিত আছে, তা এমনি ধরনের বর্জনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা এসব বস্তুকে স্বীয় নফসের জন্যে ক্ষতিকর মনে করেছেন কিংবা কোন বুযুর্গ ক্ষতিকর বলেছেন। তাই প্রতিকারার্থে তা বর্জন করেছেন। এতে কোন দোষ নেই।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ – অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করো না। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা সীমাতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, কোন হালাল বস্তুকে বিনা ওযরে ছোয়াব মনে করে বর্জন করা। অজ্ঞ ব্যক্তি একে তাকওয়া তথা খোদাভীরুতা মনে করে। অথচ আল্লাহ্র কাছে এটা সীমাতিক্রম ও অবৈধ।

তাই দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ – অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাআলা যে পবিত্র ও হালাল বস্তু তোমাদেরকে দিয়েছেন, তা খাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস রয়েছে।

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হালাল ও পবিত্র বস্তুকে ছোয়াব মনে করে বর্জন করা তাকওয়া নয়, বরং আল্লাহ্র নেয়ামত মনে করে ব্যবহার করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মধ্যেই তাকওয়া নিহিত। হাঁ, কোন দৈহিক ও আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থে কোন বস্তু বর্জন করলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

**শপথের কয়েকটি প্রকার ও তার বিধান ঃ** আলোচ্য আয়াতে শপথের কয়েকটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সূরা-বাকারায়ও বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোর সারকথা এই যে, যদি অতীত ঘটনা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা হয়, তবে ফেকাহ্বিদদের পরিভাষায় এরূপ শপথকে 'এয়ামীনে গুমূস' বলা হয়। উদাহরণতঃ কেউ একটি কাজ করে ফেলল এবং সে জানে যে, এ কাজটি সে করেছে। এরপর সে জেনেশুনে শপথ করে যে, সে কাজটি করেনি। মিথ্যা শপথ কবীরা গোনাহ্ এবং ইহকাল ও পরকালে শাস্তির কারণ। কিন্তু এর জন্যে কোনরূপ কাফ্ফারা ওয়াজেব হয় না– তওবা ও এস্তেগফার করা জরুরী। এ কারণেই একে পরিভাষায় 'এয়ামীনে গুমূস' বলা হয়। কেননা, গুমূসের অর্থ, যে ডুবিয়ে দেয়। এ শপথ শপথকারীকে গোনাহ্ ও শাস্তিতে ডুবিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, নিজ ধারণায় সত্য মনে করে কোন অতীত ঘটনা সম্পর্কে শপথ করা; কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হওয়া। উদাহরণতঃ কোন সূত্রে জানা গেল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এর উপর নির্ভর করে কেউ শপথ করল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এরপর দেখা গেল যে, এটা বাস্তবের বিপরীত। এরূপ শপথকে 'এয়ামীনে লগ্ভ' বলা হয়। এরূপ শপথে গোনাহ নেই এবং কাফ্ফারাও দিতে হয় না।

তৃতীয় প্রকার এই যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার শপথ করা। এরূপ শপথকে 'এয়ামীনে মুনআকেদা' বলা হয়। এ শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজেব হয়। তবে কোন কোন অবস্থায় গোনাহ্ হয়, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় গোনাহ্ হয় না।

এস্থলে কোরআন পাকের উল্লেখিত আয়াতে লগ্ভ বলে বাহ্যতঃ এমন শপথকেই বোঝানো হয়েছে, যাতে কাফ্ফারা নেই; গোনাহ্ হোক বা না হোক। কেননা, এর বিপরীতে عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ – উল্লেখিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানে পাকড়াও করার অর্থ জাগতিকভাবে পাকড়াও, যা কাফ্ফারার আকারে হয়।

সূরা বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ

এখানে لغو বলে ঐ শপথকে বোঝানো হয়েছে, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে কিংবা কেউ নিজ ধারণায় সত্য মনে করে শপথ করে, কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হয়। এর বিপরীতে ঐ শপথ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা হয়। একে 'এয়ামীনে গুমূস' বলা হয়। অতএব, এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, এয়ামীনে লগভে গোনাহ্ নেই- 'এয়ামীনে গুমূসে' গোনাহ্ আছে, যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা হয়। সূরা-বাকারায় পারলৌকিক গোনাহ্ বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা-মায়েদার আলোচ্য আয়াতে জাগতিক নির্দেশ অর্থাৎ, কাফ্ফারা বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, এয়ামীনে লগভের জন্যে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না- অর্থাৎ, কাফ্ফারা ওয়াজেব করেন না, বরং কাফ্ফারা শুধু ঐ শপথের জন্যেই ওয়াজেব করেন যা ভবিষ্যতে কোন কাজ করা না করা সম্পর্কে করা হয় এবং অতঃপর তা ভঙ্গ করা হয়। এরপর কাফ্ফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ
اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ

অর্থাৎ, তিনটি কাজের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় যে কোন একটি কাজ করতে হবে ঃ (এক) দশ জন দরিদ্রকে মধ্যমশ্রেণীর খাদ্য সকাল-বিকাল দু'বেলা খাওয়াতে হবে কিংবা (দুই) দশ জন দরিদ্রকে 'সতর ঢাকা' পরিমাণ পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। উদাহরণতঃ একটি পাজামা অথবা একটি লুঙ্গি অথবা একটি লম্বা কোর্তা কিংবা (৩) কোন গোলাম মুক্ত করতে হবে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾ اِنَّمَا
يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿٩١﴾
وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا
عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْٓا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوْا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاَحْسَنُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٣﴾ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَ
رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ
ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٩٤﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ
حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ
مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ عَفَا اللّٰهُ
عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

*(৯০) হে মুমিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক—যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। (৯১) শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে? (৯২) তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও, রসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, আমার রসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার বৈ নয়। (৯৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোন গোনাহ্ নেই যখন ভবিষ্যতের জন্যে সংযত হয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ সৎকর্মীদেরকে ভালবাসেন। (৯৪) হে মুমিনগণ, আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন, যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌঁছতে পারবে- যাতে আল্লাহ্ বুঝতে পারেন যে, কে তাকে অদৃশ্যভাবে ভয় করে। অতএব, যে ব্যক্তি এরপর সীমা অতিক্রম করবে, তার জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৯৫) মুমিনগণ, তোমরা এহ্‌রাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজেব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে- বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসেবে কাবায় পৌঁছাতে হবে। অথবা তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজেব- কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখবে যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ্ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কান্ড করবে, আল্লাহ্ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।*

এরপর বলা হয়েছে ঃ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ – অর্থাৎ, কোন শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি এ আর্থিক কাফ্ফারা দিতে সমর্থ না হয়, তবে তার জন্যে কাফ্ফারা এই যে, সে তিন দিন রোযা রাখবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এখানে উপর্যুপরি তিন রোযা রাখার নির্দেশ রয়েছে। তাই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও অন্যান্য কয়েকজন ইমামের মতে শপথের কাফ্ফারা হিসেবে যে রোযা রাখা হবে, তা উপর্যুপরি হওয়া জরুরী।

আলোচ্য আয়াতে শপথের কাফ্ফারা প্রসঙ্গে প্রথমে اِطْعَامُ শব্দ বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অর্থ যেমন খাদ্য খাওয়ানো হয়, তেমনি কাউকে খাদ্য দান করাও হয়। তাই ফেকাহ্‌বিদগণ আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে, দাতা ইচ্ছা করলে দশ জন দরিদ্রকে ভোজনও করিয়ে দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে খাদ্য তার মালিকানায় দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ভোজন করালে তা মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য হতে হবে, যা সে নিজগৃহে খেতে অভ্যস্ত। দশজন দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে। পক্ষান্তরে খাদ্য দান করলে প্রত্যেক দরিদ্রকে একজনের ফেতরা পরিমাণ দিতে হবে। অর্থাৎ, পৌনে দু'সের গম অথবা তার মূল্য। মোটকথা, উপরোক্ত তিনটি কাজের মধ্যে যে কোন একটি করতে হবে। কিন্তু রোযা রাখা তখনই যথেষ্ট হতে পারে, যখন তিনটির মধ্যে যে কোন একটিরও সামর্থ্য না থাকবে।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**মানুষের কল্যাণের জন্যেই বস্তুজগতের সৃষ্টি ঃ** আলোচ্য আয়াতসমূহে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বকে মানুষের উপকারার্থেই সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে মানুষের বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং মানুষকে সমগ্র বিশ্বের সেবার যোগ্য করেছেন। তবে তিনি মানুষের প্রতি শুধু একটি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, আমার সৃষ্টবস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার যে সীমা আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি, তা লঙ্ঘন করবে না। যেসব বস্তু তোমাদের জন্যে হালাল ও পবিত্র করেছি, সেগুলো থেকে বিরত থাকা ধৃষ্টতা ও অকৃজ্ঞতা এবং যেসব বস্তুর বিশেষ ব্যবহারকে হারাম করেছি, তার বিরুদ্ধাচরণ করা অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ। দাসের কর্তব্য প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী তার সৃষ্টবস্তুকে ব্যবহার করা? এরই নাম দাসত্ব।

প্রথম আয়াতে মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য পরীক্ষার শর এই চারটি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুরই একটি আয়াত প্রায় একই ধরনের শব্দ সহযোগে সূরা-বাকারায়ও উল্লেখিত হয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ

এতে উপরোক্ত চার বস্তুকে رجس বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় رجس এমন নোংরা বস্তুকে বলা হয়, যার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা জন্মে। এ চারটি বস্তুও এমন যে, সামান্য সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মনেই এগুলোর প্রতি আপনা-আপনিই ঘৃণা জন্মে।

**'আযলাম'-এর ব্যাখ্যা ঃ** এ চার বস্তুর মধ্যে ازلام অন্যতম। এটি زلم -এর বহুবচন। আযলাম এমন শরকে বলা হয়, যদ্দ্বারা আরবে ভাগ্যনির্ধারণী জুয়া খেলার প্রথা প্রচলিত ছিল। দশ ব্যক্তি শরীক হয়ে

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ
وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ
وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٩٩﴾ قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ
أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن
تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ
لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ
مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن
بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

*(৯৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের উপকারার্থে এবং তোমাদের এহ্‌রামকারীদের জন্যে হারাম করা হয়েছে স্থল শিকার যতক্ষণ এহ্‌রাম অবস্থায় থাক। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার কাছে তোমরা একত্রিত হবে। (৯৭) আল্লাহ সম্মানিত গৃহ কা'বাকে মানুষের স্থীতিশীলতার কারণ করেছেন এবং সম্মানিত মাসসমূহকে, হারাম কোরবানীর জন্তুকে ও যাদের গলায় আবরণ রয়েছে। এর কারণ এই যে, যাতে তোমরা জেনে নাও যে, আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু জানেন এবং আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৯৮) জেনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল-দয়ালু। (৯৯) রসূলের দায়িত্ব শুধু পৌছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ্ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে কর এবং যা কিছু গোপনে কর। (১০০) বলে দিন : অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর-যাতে তোমরা মুক্তি পাও। (১০১) হে মুমিনগণ, এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস কর, তবে তা তোমাদের জন্যে প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল। (১০২) এরূপ কথাবার্তা তোমাদের পূর্বে এক সম্প্রদায় জিজ্ঞেস করেছিল। এরপর তারা এসব বিষয়ে অবিশ্বাসী হয়ে গেল। (১০৩) আল্লাহ্ 'বহিরা', 'সায়েবা' 'ওসীলা' এবং 'হামী' কে শরীয়তসিদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা কাফের, তারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে। তাদের অধিকাংশেরই বিবেক বুদ্ধি নেই।*

একটি উট যবাই করত। অতঃপর এর মাংস সমান দশ ভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া খেলা হত। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন অংশের চিহ্ন অবিকৃত থাকত। কোনটিতে এক এবং কোনটিতে দুই বা তিন অংশ অঙ্কিত থাকত। অবশিষ্ট তিনটি শর অংশবিহীন সাদা থাকত। এ শরগুলোকে তূনের মধ্যে রেখে খুব নাড়াচাড়া করে নিয়ে এককে অংশীদারের জন্যে একটি শর বের করা হত। যত অংশবিশিষ্ট শর যার নামে বের হত, সে তত অংশের অধিকারী হত এবং যার নামে অংশবিহীন শর হত, সে বঞ্চিত হত। আজকাল এ ধরনের অনেক লটারী বাজারে প্রচলিত আছে। এগুলোও জুয়া এবং হারাম।

**লটারীর জায়েয প্রকার :** এক প্রকার লটারী জায়েয এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে। তা এই যে, অধিকার সবার সমান এবং অংশও সমান বণ্টন করা হয়েছে। এখন কার অংশ কোনটি, তা লটারীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায়। উদাহরণতঃ একটি গৃহ চার জন অংশীদারের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। এখন মূল্যের দিক দিয়ে গৃহটিকে সমান চার ভাগে ভাগ করতে হবে। অতঃপর কে কোন ভাগ নিবে, তা যদি পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হয়, তবে লটারীর মাধ্যমে যার নামে যে অংশ আসে, তা তাকে দেয়াও জায়েয। অথবা মনে করুন, কোন একটি বস্তুর প্রার্থী এক হাজার জন এবং সবার অধিকারও সমান। কিন্তু যে বস্তুটি ভাগ করতে হবে, তা সর্বমোট একশটি। এ ক্ষেত্রেও লটারীযোগে মীমাংসা করা যায়।

**মাসআলা :** হরমের সীমার ভেতরে এহ্‌রাম অবস্থায় যেসব শিকার হারাম, তা খাদ্য জাতীয় অর্থাৎ, হালাল জন্তু হোক কিংবা অখাদ্য অর্থাৎ হারাম জন্তু হোক সবাই হারাম।

* বন্য জন্তুকে শিকার বলা হয়, যেগুলো প্রকৃতিগতভাবে মানুষের কাছে থাকে না। সুতরাং যেসব জন্তু সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত; যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, উট এগুলো যবাই করা এবং খাওয়া জায়েয।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

* তবে যেসব জন্তু দলীলের ভিত্তিতে ব্যতিক্রমধর্মী, সেগুলোকে ধরা এবং বধ করা হালাল। যেমন, সামুদ্রিক জন্তু শিকার। দলীল এই : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ (তোমাদের জন্যে সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে।) কিছুসংখ্যক স্থলভাগের জন্তু, যেমন-কাক, চিল, বাঘ, সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর-প্রভৃতি বধ করা হালাল। এমনিভাবে যে হিংস্র জন্তু নিজে আক্রমণ করে, সেটিকে বধ করাও হালাল। হাদীসে এগুলোর ব্যতিক্রম উল্লেখিত হয়েছে।

* যে হালাল জন্তু এহ্‌রাম ছাড়া অবস্থায় এবং হরমের বাইরে শিকার করা হয়, এহ্‌রামওয়ালা ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়া জায়েয। যদি সে জন্তুকে শিকার করা ও বধ করার কাজে সে নিজে সহায়ক কিংবা পরামর্শদাতা কিংবা জন্তুর প্রতি ইঙ্গিতকারী না হয়। হাদীসে তাই বলা হয়েছে এবং আয়াতের لَا تَقْتُلُوا শব্দেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, আয়াতে لَا تَقْتُلُوا (বধ করো না) বলা হয়েছে- لَا تَأْكُلُوا (খেয়ো না) বলা হয়নি।

* হরমের এলাকায় প্রাপ্ত শিকারকে জেনেশুনে বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজেব হয়, তেমনিভাবে ভুলক্রমে বা অজান্তে বধ করলেও বিনিময় ওয়াজেব।-(রুহুল-মা'আনী)

* প্রথম বার বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজেব, এমনিভাবে দ্বিতীয়-তৃতীয় বার বধ করলেও বিনিময় ওয়াজেব।

* বিনিময়ের সারমর্ম এই যে, যে সময়ে এবং যে স্থানে জন্তুকে বধ করা হয়, উত্তম এই যে, দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা (একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারাও জায়েয) জন্তুর মূল্য অনুমান করাতে হবে। যদি নিহত জন্তু খাবার অযোগ্য (অর্থাৎ, হারাম) হয়, তবে এর মূল্য একটি ছাগলের মূল্যের চাইতে বেশী ওয়াজেব হবে না। আর যদি জন্তুটি খাবারযোগ্য (অর্থাৎ, হালাল) হয়, তবে যে পরিমাণ মূল্য অনুমান করা হবে, তাই ওয়াজেব হবে। উভয় অবস্থায় পরবর্তীতে তিনটি কাজের মধ্য থেকে সে যেকোন একটি করতে পারে। হয় এ মূল্যের দ্বারা কোরবানীর শর্তানুযায়ী কোন জন্তু ক্রয় করে হেরেমের সীমানার ভিতরে তা জবাই করে মাংস ফকিরদের মধ্যে বন্টন করে দিবে, না হয় এ মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য ফেতরার শর্তানুযায়ী প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছা'হিসেবে দান করে দিবে এবং না হয় সে খাদ্যশস্য অর্ধ ছা'হিসেবে যতজনকে দেয়া যেত ততসংখ্যক রোযা রাখবে। খাদ্যশস্য বন্টন এবং রোযা রাখা হেরেমের ভিতরে হওয়া শর্ত নয়। যদি অনুমানকৃত মূল্য অর্ধ ছা'থেকেও কম হয়, তবে ইচ্ছা করলে তা একজন ফকিরকে দিয়ে দিতে পারবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোযা রাখতে পারবে। এমনিভাবে প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছা' হিসেবে দেয়ার পর যদি অর্ধ ছা' থেকে কম অবশিষ্ট থাকে, তবুও ইচ্ছা করলে তা এক মিসকীনকে দিয়ে দিবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোযা রাখবে। আমাদের দেশে প্রচলিত ওজন অনুযায়ী অর্ধ ছা'পৌণে দুই সেরের সমান।

* উল্লেখিত অনুমানে যতজন মিসকিনের অংশ সাব্যস্ত হয়, যদি তাদেরকে দু'বেলা পেটভরে আহার করিয়ে দেয়, তবে তাও জায়েয।

* যদি এ মূল্য দিয়ে যবেহ্ করার জন্যে জন্তু ক্রয় করার পর কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তবে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে ইচ্ছা করলে অন্য জন্তু ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্য ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্যের হিসেবে রোযা রাখতে পারবে। জন্তু বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজেব হয়, তেমনিভাবে জন্তুকে আহত করলেও অনুমান করাতে হবে যে, এ আঘাতের ফলে জন্তুটির কতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে। অতঃপর হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য দিয়ে পূর্বোক্ত তিনটি কাজের যে কোন একটি কাজ করা জায়েয হবে।

* এহ্‌রাম বাঁধা ব্যক্তির পক্ষে যে জন্তু শিকার করা হারাম সেই জন্তুকে যবেহ্ করাও হারাম। তার যবেহ্‌কৃত জীবটি মৃত বলে গণ্য হবে। لَا تَقْتُلُوا বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এহ্‌রাম বাধা ব্যক্তির পক্ষে যবেহ্ করা বধ করারই অনুরূপ।

* যদি কোন অনাবাদী জায়গায় জন্তু বধ করা হয়, তবে নিকটতম জনবসতির বাজার দর হিসাবে মূল্য অনুমান করতে হবে।

* শিকার কাজের জন্য ইঙ্গিত-ইশারা করা, বলে দেয়া এবং সাহায্য করাও শিকার করার মতই হারাম।

**শান্তির চারটি উপায় ঃ** প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা চারটি বস্তুকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও শান্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ কা'বা। আরবী ভাষায় কা'বা চতুষ্কোণবিশিষ্ট গৃহকে বলা হয়। আরবে খাছ্‌আম গোত্রের নির্মিত অপর একটি গৃহও এ নামে খ্যাত ছিল। সে গৃহকে 'কা'বা এমানিয়াহ্' বলা হত। তাই বায়তুল্লাহ্‌কে সে কা'বা থেকে স্বতন্ত্র করে বোঝাবার জন্যে কা'বা শব্দের সাথে الْبَيْتَ الْحَرَامَ শব্দ যোগ করা হয়েছে।

قيام ও قوام শব্দটি اسم مصدر -এর অর্থ ঐ সব বস্তু, যার উপর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তাই قِيٰمًا لِّلنَّاسِ – এর অর্থ হবে এই যে, কা'বা ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহ মানুষের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কারণ এবং উপায়।

ناس শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে স্থানের ইঙ্গিতে বিশেষভাবে মক্কার লোকজন কিংবা আরববাসী কিংবা সমগ্র বিশ্বের মানুষকেও বোঝা যেথে পারে। বাহ্যতঃ সমগ্র বিশ্বের মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে মক্কা ও আরববাসীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজেই আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তাআলা কা'বা তথা বায়তুল্লাহ্‌কে এবং পরবর্তীতে উল্লেখিত আরও কতিপয় বস্তুকে সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপায় করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত জগতের প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলের মানুষ বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকবে এবং হজ্জ্বব্রত পালন করতে থাকবে, অর্থাৎ, যাদের উপর হজ্জ্ব ফরয, তারা হজ্জ্ব করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত থাকেব। পক্ষান্তরে যদি এক বছরকালও কেউ হজ্জ্বব্রত পালন না করে কিংবা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে কেউ নামায আদায় না করে, তবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক আযাব নেমে আসবে।

**কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ ঃ** এ বিষয়বস্তুটি তফসীরবিদ হযরত আতা (রহঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ
খানায়ে-কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ। যতদিন এর দিকে মুখ করা হবে এবং হজ্জ্ব পালিত হতে থাকবে, ততদিনই জগৎ প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোন সময় বায়তুল্লাহ্‌র এ সম্মান বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিশ্বকেও বিলীন করে দেয়া হবে। বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও বায়তুল্লাহ্‌র মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে, তার স্বরূপ জানা জরুরী নয়। যেমন, চুম্বক লোহা এবং বিশেষ প্রকারের আঠা ও খড়-কুটোর পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেউ জানে না। কিন্তু এটি এমন একটি বাস্তব সত্য, যা চোখেই দেখা যায়; কেউ একে অস্বীকার করতে পারে না। বায়তুল্লাহ্‌র ও বিশ্ব-ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের সাধ্যাতীত। বিশ্ব-স্রষ্টার বর্ণনার মাধ্যমেই তা জানা যায়। বায়তুল্লাহ্‌র সমগ্র বিশ্বের স্থায়ীত্বের কারণ হওয়া এটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বহ্যিক দৃষ্টি তা অনুভব করতে পারে না, কিন্তু আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য এটি যে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ, তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত।

**বায়তুল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্ব-শান্তির কারণ ঃ** সাধারণতঃ বিশ্বে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কারণে ডাকাত চোর, হত্যা ও লুন্ঠনকারীরা দুঃসাহস করতে পারে না। কিন্তু জাহেলিয়াত যুগের আরবে কোন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিংবা জন-নিরাপত্তার জন্যে কোন নিয়মিত আইনও প্রচলিত ছিল না। গোত্রীয় কাঠামোতেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের জান-মাল ও মান-সম্ভ্রমের উপর যখন ইচ্ছা আক্রমণ করতে পারত। কাজেই কোন গোত্রের পক্ষে কখনও শান্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ ছিল না। আল্লাহ্ তাআলার স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরতের বলে মক্কার বায়তুল্লাহ্‌কে রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করে শান্তির উপায় করে দেন। রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার মত ধৃষ্টতা যেমন, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারে না, বায়তুল্লাহ্ শরীফের মর্যাদা ক্ষুন্ন করার সাহসও তেমনিভাবে কেউ করতে পারত না। আল্লাহ্ তাআলা জাহেলিয়াত যুগে বায়তুল্লাহ্ শরীফের সম্মান ও মাহাত্ম্য

সাধারণ মানুষের অন্তরে এমনভাবে সংস্থাপিত করে দেন যে, তারা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতেও কুণ্ঠিত হত না।

সে যুগের আরবদের রণোন্মাদনা ও গোত্রগত বিদ্বেষ সারা বিশ্বের প্রবাদবাক্যের মত খ্যাত ছিল। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে বায়তুল্লাহ্ ও তার আনুষঙ্গিক বস্তুসামগ্রীর সম্মান ও মাহাত্ম্য এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, প্রাণের ঘোরতর শত্রু কিংবা কঠোরতম অপরাধীও যদি একবার হারাম শরীফের সীমানায় আশ্রয় নিতে পারত, তবে তার সাত খুন মাফ হয়ে যেত। তারা তীব্র দুঃখ ও ক্রোধ সত্ত্বেও তাকে কিছুই বলত না। হেরেমের অভ্যন্তরে পিতৃহন্তাকে চোখের সামনে দেখেও তারা চক্ষু নত করে চলে যেত।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি হজ্জ ও ওমরার নিয়তে বাড়ী থেকে বের হত কিংবা যে জন্তু হারাম শরীফে কোরবানীর জন্যে আনা হত, তার প্রতিও আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত এবং কোন অতি মন্দ ব্যক্তিও এর ক্ষতি করত না। হজ্জ ও ওমরার কোন লক্ষণ কিংবা কণ্ঠাভরণ বাধা অবস্থায় কোন প্রাণের শত্রুকেও তারা কিছুই বলত না।

ষষ্ঠ হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একদল সাহাবায়ে কেরামকে সাথে করে ওমরার এহ্রাম বেধে বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশে রওয়ানা হন। হেরেম শরীফের সীমানার সন্নিকটে হোদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি করেন এবং হযরত ওছমান (রাঃ)-কে কয়েকজন সঙ্গীসহ মক্কায় পাঠিয়ে দেন, যাতে তাঁরা মক্কার সর্দারদেরকে বলে দেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধের নিয়তে নয়-ওমরা আদায় করার জন্যে এসেছেন। কাজেই তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত হবে না।

মোটকথা, জাহেলিয়াত যুগেও আল্লাহ্ তাআলা আরবদের মনে হারাম শরীফের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল; এ সম্মানের ফলশ্রুতিতে শুধু হারাম শরীফের ভেতরে যাতায়াতকারী লোকজন এবং বিশেষ চিহ্ন পরিহিত অবস্থায় হজ্জ ও ওমরার জন্যে আগমনকারীরা নিরাপদ হয়ে যেত বটে, কিন্তু বহির্বিশ্বের লোকজন এদ্বারা কোন উপকার, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারত না। কিন্তু আরবে যেভাবে বায়তুল্লাহ্ ও হারাম শরীফের সম্মান ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হতো, তেমনিভাবে হজ্জের মাসগুলোর প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হত। আরবরা এ মাসগুলোকে 'আশহুরে হুরুম' বা সম্মানিত মাস বলত। কেউ কেউ এগুলোর সাথে রজব মাসকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এসব মাসে হেরেমের বাইরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকেও আরবরা হারাম মনে করত এবং এ থেকে সযত্নে বেঁচে থাকত।

এ কারণে কোরআন পাক মানুষের স্থায়িত্বের উপায় হিসেবে কা'বার সাথে আরও তিনটি বস্তুর উল্লেখ করেছে ঃ প্রথমতঃ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ অর্থাৎ, সম্মান ও মহত্বের মাস। এখানে شهر শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেছেন যে, এখানে شهر حرام বলে জিলহজ্জ মাসকে বোঝানো হয়েছে। এমাসেই হজ্জের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, শব্দটি একবচন হলেও অর্থের দিক দিয়ে جنس হওয়ার কারণে অন্যান্য সম্মানিত মাসও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় বস্তু হচ্ছে هدى হারাম শরীফে যে জন্তুকে কোরবানী করা হয়, তাকে هدى বলা হয়। যে ব্যক্তির সাথে এরূপ জন্তু থাকত, সে নির্বিবাদে পথ চলতে পারত; তাকে কেউ কিছু বলত না। এভাবে কোরবানীর জন্তুও



ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম উপায়।

তৃতীয় বস্তু قلائد – এটি قلادة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, গলার হার। জাহেলিয়াত যুগের আরবে প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজ্জের উদ্দেশে বের হলে চিহ্নস্বরূপ গলায় একটি হার পরে নিত – যাতে একে দেখে সবাই বুঝতে পারে যে, লোকটি হজ্জ করতে যাচ্ছে, ফলে কেউ যেন তাকে কোন কষ্ট না দেয়। কোরবানীর জন্তুর গলায়ও এধরনের হার পরিয়ে দেয়া হত। এসব হারকেও قلائد বলা হয়। এ কারণে قلائد ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হয়ে যায়।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, সম্মানিত মাসসমূহ, কোরবানীর জন্তু এবং গলার হার এ তিনটি বস্তুই-বায়তুল্লাহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদের সম্মানও বায়তুল্লাহ্র সম্মানেরই একেকটি অংশ। সারকথা এই যে, বায়তুল্লাহ্ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আল্লাহ্ তাআলা সমগ্র বিশ্বমানবের জন্যে সাধারণভাবে এবং আরব ও মক্কাবাসীদের জন্যে বিশেষভাবে স্থায়িত্বের উপায় করে দিয়েছেন।

قِيٰمًا لِّلنَّاسِ এর ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন, এর অর্থ এই যে, বায়তুল্লাহ্ ও হারামকে সবার জন্যে শান্তির আবাসস্থল করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে মক্কাবাসীদের জন্যে রুযি-রোযগারের সুবিধা দান। কেননা, এখানে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সারা বিশ্বের জিনিসপত্র এখানে পৌছিয়ে দেন।

কেউ বলেন, মক্কাবাসীরা যেহেতু কা'বা গৃহের খাদেম ও সংরক্ষক বলে পরিচিত ছিল, তাই তাদেরকে আল্লাহ্ভক্ত মনে করে সর্বদা মানুষ তাদের সম্মান করত। قِيٰمًا لِّلنَّاسِ বাক্যে তাদের এ বিশেষ সম্মানকেই বোঝানো হয়েছে।

ইমাম আবদুল্লাহ্ রাযী (রাহঃ) বলেন, এসব উক্তির মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য নেই। এসবগুলোই উপরোক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বায়তুল্লাহ্কে সব মানুষের স্থায়িত্ব, ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সাফল্যের উপায় করেছেন এবং আরব ও মক্কাবাসীদেরকে বিশেষভাবে এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মঙ্গল ও বরকত দ্বারা ভূষিত করেছেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ, আমি বায়তুল্লাহ্ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে মানুষের জন্যে স্থায়িত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় করেছি। আরববাসীরা বিশেষভাবে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে। এটা এজন্যে বলা হয়েছে যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ্ তাআলা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের যাবতীয় বিষয় যথাযথভাবে জানেন এবং তিনিই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ, জেনো, আল্লাহ্ তাআলা কঠোর শাস্তিদাতা এবং আল্লাহ্ তাআলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। এতে বলা হয়েছে যে, হালাল ও হারামের যেসব বিধান দেয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত উপযোগী। এগুলো পালন করার মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত। পক্ষান্তরে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ

করা কঠোর শাস্তির কারণ। সাথে সাথে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, মানবীয় ভুলভ্রান্তি ও ঔদাসীন্যের কারণে কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে আল্লাহ্ তাআলা তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না, বরং তওবাকারী-অনুতপ্ত লোকদের জন্যে ক্ষমার দ্বারও উন্মুক্ত রাখেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছেঃ

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ

– অর্থাৎ, আমার রসূলের দায়িত্ব এতটুকুই যে, তিনি আমার নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন। এরপর তা মানা না মানার লাভ ও ক্ষতি তারাই ভোগ করবে; তারা না মানলে আমার রসূলের কোনই ক্ষতি নেই। এ কথাও জেনো যে, আল্লাহ্ তাআলাকে ধোঁকা দেয়া যাবে না। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ

আরবী ভাষায় خبيث ও طيب দু'টি বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে طيب এবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে خبيث বলা হয়। আয়াতে অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে خبيث শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং طيب শব্দ দ্বারা হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। অতএব, আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে বরং প্রত্যেক সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের দৃষ্টিতেও পবিত্র ও অপবিত্র এবং হালাল ও হারাম সমান হতে পারে না।

এক্ষেত্রে خبيث ও طيب শব্দ দু'টি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম অর্থ-সম্পদ, উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভাল ও মন্দ কাজ-কর্ম ও চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কোন সুস্থ বিবেকবানের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সমান নয়। এ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলার কাছে হালাল ও হারাম কিংবা পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। এমনিভাবে ভাল ও মন্দ কাজ-কর্ম ও চরিত্র এবং সৎ ও অসৎ লোকও সমান নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ অর্থাৎ, যদিও মাঝে মাঝে মন্দ ও অনুৎকৃষ্ট বস্তুর প্রাচুর্য দর্শকদেরকে বিস্মিত করে দেয় এবং আশ-পাশে মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর ব্যাপক প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভাল বলে মনে করতে থাকে, কিন্তু আসলে এটি মানুষের অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ত্রুটি বিশেষ।

**অনাবশ্যক প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ ঃ** আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক খোদায়ী বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা ঘাঁটাঘাঁটি করতে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং যেসব বিধান দেয়া হয়নি, সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে। আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন এরূপ প্রশ্ন না করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা কষ্টে পতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাঁস হওয়ার কারণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

**শানে নুযূল ঃ** মুসলিমের রেওয়ায়েত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নুযুল এই যে, যখন হজ্ব ফরয হওয়া সম্পর্কিত আদেশ অবতীর্ণ হয়, তখন আ'করা ইবনে হাবেস (রাঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্ আমাদের জন্যে কি প্রতি বছরই হজ্ব করা ফরয? রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকারী পুনর্বার প্রশ্ন করলেন। তিনি তবুও চুপ। প্রশ্নকারী তৃতীয় বার প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের সুরে বললেন ঃ যদি আমি তোমার উত্তরে বলে দিতাম যে, হাঁ, প্রতি বছরই হজ্ব ফরয, তবে তাই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন করতে পারতে না। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দেই না, সেগুলোকে সেভাবেই থাকতে দিও-ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্বে কোন কোন উম্মত বেশী প্রশ্ন করেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ্ ও রসূল যেসব বিষয় ফরয করেননি, তারা প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল। আমি যে কাজের আদেশ দেই, সাধ্যানুযায়ী তা পালন করা এবং যে কাজে নিষেধ করি, তা পরিত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। (অর্থাৎ, যেসব বিষয়ে আমি নীরব থাকি, সেগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে না)।

**মহানবী (সাঃ)-এর পর নবুওয়ত ও ওহী আগমনের সমাপ্তি ঃ** এ আয়াতে একটি প্রাসঙ্গিক বাক্যে বলা হয়েছে ঃ وَاِنْ تَسْـَٔلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ অর্থাৎ, কোরআন অবতরণকালে যদি তোমরা এরূপ প্রশ্ন কর, তবে ওহীর মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে। এতে 'কোরআন অবতরণকালে' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন অবতরণ সমাপ্ত হলে নবুওয়ত ও ওহীর আগমনও বন্ধ করে দেয়া হবে।

নবুওয়াতের আগমন খতম হয়ে যাওয়া ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের প্রশ্নের ফলে যদিও নতুন কোন বিধান আসবে না এবং যা ফযর নয়, তা ফযর হবে না কিংবা ওহীর মাধ্যমে কারও গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে না, তথাপি অনাবশ্যক প্রশ্ন তৈরী করে সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা নবুওয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধই থাকবে। কেননা, এতে করে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه অর্থাৎ, মুসলমান হওয়ার একটি সৌন্দর্য এই যে, মুসলমান ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে। আজকাল অনেক মুসলমান অনর্থক বিষয়াদির তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। আজকাল মূসা (আঃ)-এর মায়ের নাম কি ছিল, নূহ (আঃ) এর নৌকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কি ছিল, ইত্যাকার প্রশ্নের কোন সম্পর্ক মানুষের কর্মের সাথে নাই। উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, এ জাতীয় প্রশ্ন করা নিন্দনীয়, বিশেষ করে যখন এ কথাও জানা যায় যে, এরূপ প্রশ্নকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ন ধর্মীয় মাসআলা সম্পর্কেই অজ্ঞ থাকে। অনর্থক কাজে ব্যাপৃত হওয়ার ফলে মানুষ জরুরী কাজ থেকে বঞ্চিত থাকে। অতীতে ফেকাহ্বিদ আলেমগণ মাসআলা-মাসায়েলের অনেক কাল্পনিক দিক বের করে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরী করে শরীয়তের বিধান বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে এগুলো জরুরী ছিল। তাই এসব প্রশ্ন অনর্থক ও অনাবশ্যক ছিল না। ইসলামের অন্যতম শিক্ষা এই যে, কোন দ্বীনী কিংবা জাগতিক উপকার লক্ষ্য না হলে যে কোন জ্ঞানানুশীলন, কর্ম অথবা কথায় ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়।

**বহিরা, সায়েবা ইত্যাদির সংজ্ঞা ঃ** 'বহিরা' 'সায়েবা' 'ওছিলা' 'হামী' প্রভৃতি সবই জাহেলিয়াত যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরবিদদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। তবে আলোচ্য শব্দগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভবপর। আমরা সহীহ্ বুখারী থেকে সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেবের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি।

'বহিরা' এমন জন্তুকে বলা হয় যার দুধ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হত এবং কেউ নিজের কাজে ব্যবহার করত না।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا
حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا
يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا
حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ
أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم
مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ
إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ
شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا
إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا
اعْتَدَيْنَا ۖ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا
بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

*(১০৪) যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান এবং রসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে পেয়েছি। যদি তাদের বাপ-দাদারা কোন জ্ঞান না রাখে এবং হেদায়েতপ্রাপ্ত না হয় তবুও কি তারা তাই করবে? (১০৫) হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করতে। (১০৬) হে, মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওছিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ন দুজনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু' ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহ্‌র নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গোনাহ্‌গার হব। (১০৭) অতঃপর যদি জানা যায় যে, উভয় ওসি কোন গোনাহে জড়িত রয়েছে, তবে যাদের বিরুদ্ধে গোনাহ্ হয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে মৃত ব্যক্তির নিকটতম দু' ব্যক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র নামে কসম খাবে যে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্যের চাইতে অধিক সত্য এবং আমরা সীমা অতিক্রম করিনি। এমতাবস্থায় আমরা অবশ্যই অত্যাচারী হব। (১০৮) এটি এ বিষয়ের নিকটতম উপায় যে, তারা ঘটনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করবে অথবা আশঙ্কা করবে যে, তাদের কাছ থেকে কসম নেয়ার পর আবার কসম চাওয়া হবে। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং শুন, আল্লাহ্ দুরাচারীদেরকে পথ-প্রদর্শন করবেন না।*



'সায়েবা' ঐ জন্তু, যাকে প্রতিমার নামে আমাদের দেশের ষাঁড়ের মত ছেড়ে দেয়া হত।

'হামী' পুরুষ উট, যে বিশেষ সংখ্যক রমন ক্রিয়া সমাপ্ত করে। এরূপ উটকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত।

'ওছিলা' যে উষ্ট্রী উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। জাহেলিয়াত যুগে এরূপ উষ্ট্রীকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেয়া হত।

এসব শিরকের নিদর্শনাবলী তো ছিলই; তদুপরি যে জন্তুর মাংস, দুধ ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া আল্লাহ্‌র আইনে বৈধ, নিজেদের পক্ষ থেকে শর্তাদি আরোপ করে সে জন্তুকে হালাল ও হারাম করার অধিকার তারা কোথায় পেল? মনে হয়, তারা শরীয়ত প্রণেতার পদে নিজেরাই আসীন হয়ে গিয়েছিল। আরও অবিচার এই যে, নিজেদের এসব মুশরেক সুলভ কুপ্রথাকে তারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের উপায় বলে মনে করত। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা কখনও এসব প্রথা নির্ধারণ করেননি, বরং তাদের বড়রা আল্লাহ্‌র প্রতি এ অপবাদ আরোপ করেছে এবং অধিকাংশ নির্বোধ জনগণ একে গ্রহণ করে নিয়েছে। মোটকথা, এখানে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অনর্থক প্রশ্ন করে শরীয়তের বিধানে সংকীর্ণতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করা যেমন অপরাধ, তেমনি শরীয়ত প্রণেতার নির্দেশ ছাড়া স্বীয় অভিমত ও প্রবৃত্তি দ্বারা হালাল-হারাম নির্ধারণ করা আরও বড় অপরাধ।

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا
حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হত যে, তোমরা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ সত্য বিধানাবলী ও রসূলের দিকে এস, যা সর্বদিক দিয়ে উপযোগী এবং তোমাদের মঙ্গল ও সাফল্যের রক্ষাকবচ, তখন তারা এছাড়া কোন উত্তর দিত না যে, আমরা বাপ-দাদাদিগকে যে তরীকায় পেয়েছি, আমাদের জন্যে তাই যথেষ্ট।

এ শয়তানী যুক্তিই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করেছে। কোরআন পাক এর উত্তরে বলে ঃ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারে যে, কোরআন পাকের এ বাক্যটি কোন ব্যক্তি অথবা দলের অনুসরণ করার ব্যাপারে একটি বিশুদ্ধ মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। ফলে অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে এবং মূর্খ ও গাফেলদের জন্যে সত্য প্রকাশের পথ খুলে গেছে। মূলনীতিটি এই যে, অজ্ঞরা জ্ঞানবানদের,অনভিজ্ঞরা অভিজ্ঞদের এবং মূর্খরা জ্ঞানীদের অনুসরণ করবে-একথা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি ও হেদায়েতের মাপকাঠি পরিত্যাগ করে বাপ-দাদা কিংবা ভাই-বন্ধুদের অনুসরণকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। অনুসৃত ব্যক্তি নিজে কোথায় যাচ্ছে এবং অনুসারীদেরকেই বা কোথা নিয়ে যাবে একথা না জেনে তার পদাঙ্ক অনুসরণে লেগে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনিভাবে কিছুসংখ্যক লোক বেশী মানুষের সমাগমকেই অনুসরণের মাপকাঠি মনে করে। যার কাছে মানুষের ভিড় দেখে তারা তারই অনুসরণে

লেগে যায়। এটিও একটি অযৌক্তিক কাজ। কেননা, জগতে সব সময়ই বেওকুফ, নির্বোধ ও কুকর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই মানুষের ভিড়ই সত্যাসত্য ও ভাল-মন্দ চিহ্নিত করার মাপকাঠি হতে পারে না।

**অযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করা ধ্বংস ডেকে আনার শামিল ঃ** কোরআন পাকের এ বাক্যের সুস্পষ্ট শিক্ষা এই যে, বাপ-দাদা, ভাই-বেরাদর ইত্যাদি কেউ অনুসৃত হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বপ্রথম স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও জীবনযাত্রার গতিপথ নির্ধারণ করা জরুরী। এরপর তা অর্জনের জন্যে দেখা দরকার যে, এমন ব্যক্তি কে, যার এ লক্ষ্য অর্জনের পথ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে এবং এ পথে নিজেও চলছেন। এমন ব্যক্তি পাওয়া গেলে তার অনুসরণ অবশ্যই মনযিলে-মকছুদে পৌঁছাতে পারে। মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণের তাৎপর্যও তাই। তাঁরা দ্বীন সম্পর্কে যেমন সম্যক অবগত, তেমনি নিজেরাও এ পথেই চলেন। তাই অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের অনুসরণ করে ধর্মের লক্ষ্য অর্থাৎ, আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ পালন করতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেই বিপথগামী, যার মনযিলে-মকছুদ জানা নেই কিংবা জেনেশুনে বিপরীত দিকে ধাবমান, তার পিছনে চলা জ্ঞানী মাত্রের দৃষ্টিতেই নিজ প্রচেষ্টা ও কর্মকে বিনষ্ট করার শামিল বরং ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর। দুঃখের বিষয়, বর্তমান জ্ঞান-গরিমা ও আধুনিকতার যুগেও শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ সত্যের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করছে। বর্তমান ধ্বংস ও বিপর্যয়ের প্রধান কারণই হচ্ছে অযোগ্য ও ভ্রান্ত নেতাদের অনুসরণ।

**অনুসরণের মাপকাঠি ঃ** কোরআন পাকের এ বাক্য দু'টি বিষয়কে অনুসরণের যুক্তিযুক্ত ও সুস্পষ্ট মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছে ঃ একটি علم ও অপরটি اهتداء এখানে علم – এর অর্থ মনযিলে-মকছুদ ও মনযিলে-মকছুদ পর্যন্ত পৌঁছার পথ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং اهتداء এর অর্থ এ লক্ষ্যের পথে চলা, অর্থাৎ, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্ম।

সারকথা এই যে, অনুসরণ করার জন্যে যে ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে প্রথমে দেখে নিবে যে, অভীষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যের পথ সম্পর্কে সে অবগত কি না। এরপর দেখবে, সে নিজেও সে পথেই চলছে কি না এবং তার কর্ম তার জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি নয়।

মোটকথা, কাউকে অনুসৃতব্য সাব্যস্ত করার জন্যে তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্মের কষ্টিপাথরে যাচাই করা জরুরী। শুধু বাপ-দাদা হওয়া কিংবা অনেক মানুষের নেতা হওয়া অথবা ধনাঢ্য হওয়া কিংবা রাষ্ট্রের অধিপতি হওয়া ইত্যাদি কোনটিই অনুসরণের মাপকাঠি হওয়ার যোগ্য নয়।

**কারও সমালোচনা করার কার্যকরী পন্থা ঃ** কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে বাপ-দাদার অনুসরণে অভ্যস্ত লোকদের বিভ্রান্তি ব্যক্ত করার সাথে সাথে অন্যের সমালোচনা ও তার বিভ্রান্তি প্রকাশ করার একটি কার্যকরী পন্থাও শিক্ষা দিয়েছে। এ পন্থায় সমালোচনা করলে সমালোচিত ব্যক্তি ব্যথিত কিংবা উত্তেজিত হয় না। কেননা, পৈতৃক ধর্ম অনুসরণকারীদের জওয়াবে কোরআন পাক এ কথা বলেনি যে, তোমাদের বাপ-দাদা মূর্খ ও পথভ্রষ্ট। বরং বিষয়টিকে প্রশ্নের আকারে বলেছে ঃ বাপ-দাদার অনুসরণ তখনও কি যুক্তিযুক্ত হতে পারে, যখন বাপ-দাদার মধ্যে না থাকে জ্ঞান এবং না থাকে সৎকর্ম?

**যারা মানুষের সংশোধন চিন্তা করে তাদের জন্যে একটি সান্ত্বনাঃ** দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের সংশোধন চিন্তায় সবকিছু বিসর্জনকারী মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছেঃ সত্যপ্রচার ও শিক্ষায় তোমাদের সাধ্যমত চেষ্টা এবং যথাযথ হিতকাঙ্খার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্টতায়ই ডুবে থাকে, তবে এর জন্যে মোটেই চিন্তিত হইও না। এমতাবস্থায় অন্যের পথভ্রষ্টতার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

অর্থাৎ, হে মুসলমানগণ, তোমরা নিজেও চিন্তা কর। তোমরা যখন সঠিক পথে চলছ, তখন যে বিপথগামী, তার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি নেই।

এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজের কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট। অন্যরা যা ইচ্ছা করুক। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অথচ এ বিষয়টি কোরআন পাকের বহু আয়াতের পরিপন্থী। সেসব আয়াতে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বারণ' করাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কিছু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি 'সৎকাজে আদেশ দান' – এর পরিপন্থী নয়। তোমরা যদি 'সৎকাজে আদেশ দান' পরিত্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে। এজন্যেই তফসীর বাহরে মুহীতে হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়র থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে, তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। জেহাদ এবং 'সৎকাজে আদেশ' দানও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো করার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কোরআনের إِذَا اهْتَدَيْتُمْ শব্দে চিন্তা করলে এ তফসীরের যথার্থতা ফুটে উঠে। কেননা, এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের পথভ্রষ্টতা তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর নয়। এখন এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি 'সৎকাজে আদেশ দান'এর কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে চলমান নয়।

তফসীর দুররে মনসুরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের (রাঃ) একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। তাঁকে কোন এক ব্যক্তি বলল যে, অমুক অমুক ব্যক্তির মধ্যে ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ রয়েছে। তারা একে অপরকে মুশরেক বলে অভিহিত করে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি কি মনে কর যে,আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাকে আদেশ করব? কখনই নয়। যাও, তাদেরকে নম্রতার সাথে বোঝাও। যদি মানে উত্তম; নতুবা তাদের চিন্তা ছেড়ে নিজের চিন্তা কর। অতঃপর এ উক্তির প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন।

**পাপ দমন সম্পর্কে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর একটি ভাষণঃ** আয়াতের বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে বাহ্যদৃষ্টিতে যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) এক ভাষণে বললেন ঃ তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে অস্থানে প্রয়োগ করছ এবং বলছ যে, 'সৎকাজে আদেশ দান'-এর প্রয়োজন নেই। জেনে রাখ, আমি নিজে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর মুখে শুনেছি ঃ যারা কোন পাপকাজ হতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) তা দমন করতে চেষ্টা করে না, আল্লাহ্ তাআলা সত্বরই হয় তো তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত রয়েছে। আবু দাউদের

ভাষায় হাদীসটি এরূপ ঃ যারা কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) বাধা দেয় না, আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে একযোগে আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

**মাসআলা ঃ** মরণোন্মুখ ব্যক্তি যার হাতে মাল সোপর্দ করে অন্য কাউকে দিতে বলে যায়, তাকে ওসী বলা হয়। ওসী একজন বা একাধিক ব্যক্তিও হতে পারে।

০ সফরে হোক কিংবা স্বগৃহে অবস্থানকালে মুসলমান ও ধর্মপরায়ণ ওসি নিয়োগ করা উত্তম; জরুরী নয়।

০ মোকদ্দমার যে পক্ষ অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়, সে বাদী এবং অপর পক্ষ বিবাদী।

০ প্রথমে বাদীর কাছ থেকে সাক্ষী তলব করা হয়। যদি সে শরীয়তের বিধি মোতাবেক সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে, তবে তার পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেয়া হয়। পক্ষান্তরে সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারলে বিবাদীর কাছ থেকে কসম নেয়া হয় এবং তার পক্ষে মোকদ্দমার রায় দেয়া হয়। যদি বিবাদী কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে বাদীর পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেয়া হয়।

০ আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ কাল কিংবা স্থান দ্বারা কসমকে কঠোর করা বিচারকের অভিমতের উপর নির্ভরশীল— জরুরী নয়। এ আয়াত দ্বারাও জরুরী হওয়া প্রমাণিত হয় না। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস থেকেও জরুরী না হওয়া প্রমাণিত হয়।

০ বিবাদী নিজের কোন কাজ সম্পর্কে কসম খেলে ভাষা এরূপ হয়— 'আমি এ কাজ সম্পর্কে জানি না।'

০ যদি উত্তরাধিকারের মোকদ্দমার ওয়ারিস বিবাদী হয়, তবে শরীয়তের আইনানুযায়ী যারা উত্তরাধিকারী, তাদেরকেই কসম খেতে হবে তা একজন হোক কিংবা একাধিক। যারা উত্তরাধিকারী নয়, তারা কসম খাবে না।— (বয়ানুল-কোরআন)

**কাফেরের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ঃ** يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ..... اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে দু'ব্যক্তিকে ওসি নিযুক্ত কর। তারা তোমাদের মধ্য থেকেই হবে এবং ধর্মপরায়ণ হবে। যদি স্বজাতীয় লোক না থাকে, তবে বিজাতি অর্থাৎ, কাফেরদের মধ্য থেকে নিযুক্ত কর।

এ আয়াত থেকে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এ মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন যে, কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্য বৈধ। কেননা, আয়াতে কাফেরদের সাক্ষ্য মুসলমানদের ব্যাপারে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ থেকে তা সুস্পষ্ট। অতএব, কাফেরের ব্যাপারে কাফেরের সাক্ষ্য আরও উত্তম রূপে বৈধ হবে। কিন্তু পরে يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ — আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্যের বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু কাফেরদের ব্যাপারে কাফেরদের সাক্ষ্যের বৈধতা পূর্বাবস্থায়ই বহাল রয়েছে।— (কুরতুবী, আহ্কামুল-কোরআন)

ইমাম সাহেবের মতের সমর্থন এ হাদীস দ্বারাও হয়। জনৈক ইহুদী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে জনগণ তার মুখে চুনকালি মাখিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত করে। তিনি তার দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল ঃ সে ব্যভিচার করেছে। তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে অপরাধীকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।— (জাসসাস)

**প্রাপক খাতককে কয়েদ করাতে পারে ঃ** تَحْبِسُوْنَهُمَا আয়াত থেকে একটি মূলনীতি জানা যায় যে, যার যিম্মায় অপরের কোন প্রাপ্য ওয়াজেব রয়েছে, তাকে পাওনাদার ব্যক্তি পাওনার দায়ে প্রয়োজন বোধে কয়েদ করাতে পারে।— (কুরতুবী)

مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ – এখানে صلوٰة বলে আছরের নামায বুঝানো হয়েছে। এ সময়টি নির্ধারণ করার কারণ এই যে, আহলে-কিতাব এ সময়ের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করত। এ সময়ে মিথ্যা বলা তাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল। এতে বুঝা যায় যে, কোন বিশেষ সময় কিংবা স্থানের শর্ত যোগ করে কসমকে কঠোর করা জায়েয।— (কুরতুবী)

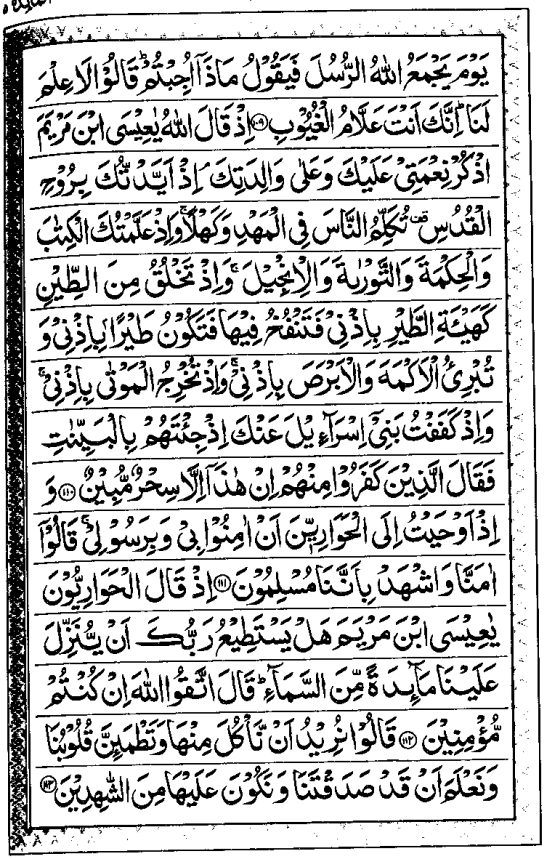

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ
لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿۱۰۹﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ
اذْكُرْ نِعْمَتِيْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ
الْقُدُسِ ۟ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ
كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًۢا بِاِذْنِيْ وَ
تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِيْ ۚ
وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَاۤ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿۱۱۰﴾ وَ
اِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِيْ وَبِرَسُوْلِيْ ۚ قَالُوْۤا
اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿۱۱۱﴾ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ
يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ
عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ؕ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ
مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۱۲﴾ قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا
وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۱۱۳﴾

*(১০৯) যেদিন আল্লাহ্ সব পয়গম্বরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেন ঃ আমরা অবগত নই; আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (১১০) যখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি তাতে ফুঁ দিতে; ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈলকে তোমা থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা বলল ঃ এটা প্রকাশ্য জাদু ছাড়া কিছুই নয়।*

*(১১১) আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আনুগত্যশীল। (১১২) যখন হাওয়ারীরা বলল ঃ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা, আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্কে ভয় কর। (১১৩) তারা বলল ঃ আমরা তা থেকে খেতে চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে, আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব।*

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**কেয়ামতে পয়গম্বরগণকে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবে ঃ** يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ কিয়ামতে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একটি উন্মুক্ত মাঠে উপস্থিত হবে। যে কোন অঞ্চলের, যে কোন দেশের এবং যে কোন সময়ের মানুষই হোক না কেন, সবাই সে সুবিশাল ময়দানে উপস্থিত হবে এবং সবার কাছ থেকে তাদের সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেয়া হবে। কিন্তু আয়াতে বিশেষভাবে নবী-রসূলগণের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ অর্থাৎ, ঐ দিনটি বাস্তবিকই স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্ তাআলা সব পয়গম্বরকে হিসাবের জন্যে একত্রিত করবেন। উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত সবাইকে করা হবে, কিন্তু সর্ব প্রথম প্রশ্ন নবী-রসূলগণকেই করা হবে যাতে সমগ্র সৃষ্টজগত দেখতে পায় যে, আজ হিসাব ও প্রশ্ন থেকে কেউ বাদ পড়বে না। পয়গম্বরগণকে যে প্রশ্ন করা হবে, তা এই ঃ مَاذَآ اُجِبْتُمْ অর্থাৎ, তোমরা যখন নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর সত্য ধর্মের দিকে আহবান করেছিলে, তখন তারা তোমাদেরকে কি উত্তর দিয়েছিল? তারা তোমাদের বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করেছিল, না অস্বীকার ও বিরোধিতা করেছিল?

এ প্রশ্নটি যদিও আম্বিয়া (আঃ)-কে করা হবে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে তাঁদের উম্মতকে শুনানো। অর্থাৎ, উম্মতরা যেসব সৎকর্ম ও কুকর্ম করেছে, তার সাক্ষ্য সর্ব প্রথম তাদের পয়গম্বরদের কাছ থেকে নেয়া হবে। উম্মতের জন্যেও মুহূর্তটি হবে অত্যন্ত নাজুক। কারণ, তারা এ হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিতে যখন নিজেদের নবী-রসূলগণের সুপারিশ আশা করবে, তখনই স্বয়ং নবী-রসূলগণের কাছে তাদের সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, আম্বিয়াগণ কোন ভ্রান্ত ও বাস্তব বিরোধী কথা বলতে পারবেন না। তাই গোনাহ্গার ও অপরাধীরা আশঙ্কা করবে যে, যখন স্বয়ং নবীগণই আমাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্যদাতা তখন আর কে আমাদের সুপারিশ ও সাহায্য করবে?

এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলবেন ঃ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ অর্থাৎ, তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আপনিই স্বয়ং যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

**একটি সন্দেহের নিরসন ঃ** এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের ওফাতের পর তাঁর যে উম্মত জন্মগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে পয়গম্বরগণের এ উত্তর নির্ভুল ও সুস্পষ্ট। কেননা, অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া কারও জানা নেই। কিন্তু বিরাট সংখ্যক উম্মত এমনও তো রয়েছে, যারা স্বয়ং পয়গম্বরগণের অক্লান্ত চেষ্টায় এ তাঁদের হাতেই মুসলমান হয় এবং তাঁদের সামনেই বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করে। এমনিভাবে যেসব কাফের পয়গম্বরগণের আদেশের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে, তাদের সম্পর্কে একথা বলা কিভাবে নির্ভুল হতে পারে যে, তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই? তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে ইমাম আবু আবদুল্লাহ্ রাযী এর উত্তরে বলেন ঃ এখানে পৃথক পৃথক দু'টি বিষয় রয়েছে ঃ (এক) এলম, যার অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস, (দুই) প্রবল ধারণা। একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সামনে থাকা সত্ত্বেও তার ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিতে পারে, পূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কেননা, অন্তরের ভেদ ও সত্যিকার ঈমান সম্পর্কে কেউ ওহী ব্যতীত নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। কারণ, ঈমানের সম্পর্ক হল অন্তরের সাথে। প্রত্যেক উম্মতেই কপট বিশ্বাসী মুনাফেকদেরও একটি দল ছিল। তারা বাহ্যতঃ ঈমানও আনত এবং নির্দেশাবলীও পালন করত,

কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না এবং নির্দেশাবলী অনুসরণের আন্তরিক কোন প্রেরণাও ছিল না। তাদের মধ্যে যা কিছু ছিল, সবই ছিল লোক দেখানো। তবে বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের উপরই জাগতিক বিচার নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, খোদায়ী নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এবং ইসলাম ও ঈমান বিরোধী কোন কথা ও কর্মে জড়িত হয় না, নবী-রসূলগণ তাকে 'ঈমানদার ও সৎকর্মী' বলতে বাধ্য ছিলেন; সে অন্তরে খাঁটি ঈমানদার কিংবা মুনাফেক যাই হোক। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ

অর্থাৎ, আমরা তো বাহ্যিক কাজকর্ম দেখে বিচার করি। অন্তর্নিহিত গোপনভেদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তাআলা।

এ বিধান অনুযায়ী দুনিয়াতে আম্বিয়া (আঃ) ও তাঁদের উত্তরাধিকারী আলেমসমাজ বাহ্যিক কাজকর্মের ভিত্তিতে কারও ঈমানদার সৎকর্মী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারতেন। কিন্তু আজ সে দুনিয়া ও দুনিয়ার রীতি-নীতি শেষ হয়ে গেছে। আজ হাশরের ময়দান। এখানে চুলচেরা তথ্য উদঘাটিত হবে এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রথমে অন্যদের সাক্ষ্য নেয়া হবে। যদি অপরাধী এতে নিশ্চিত না হয় এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকার না করে, তবে বিশেষ ধরনের সরকারী সাক্ষী উপস্থিত করা হবে। অপরাধীদের মুখে ও জিহবায় সীল মেরে দেয়া হবে এবং তাদের হস্ত,পদ ও চামড়ার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এরা প্রত্যেক কাজের পূর্ণ স্বরূপ তুলে ধরবে।-

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

অর্থাৎ, অদ্য আমি তাদের মুখে সীল মেরে দিব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের ক্রিয়া-কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তখন মানুষ জানতে পারবে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিল রাব্বুল-আলামীনের গুপ্ত পুলিশ। এদের বর্ণনার পর অস্বীকার করার কোন উপায়ই থাকবে না।

মোটকথা, পরজগতে শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কোন কিছুর বিচার করা হবে না বরং অকাট্য জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সবকিছুর বিচার হবে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কারও ঈমান ও কর্মের সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া কারও নেই। তাই হাশরের ময়দানে যখন নবী-রসূলগণকে প্রশ্ন করা হবে مَاذَآ اُجِبْتُمْ তখন তাঁরা এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলবেন যে, এ প্রশ্ন ইহজগতে হচ্ছে না যে, ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে জওয়াব দিলেই চলবে, বরং এ প্রশ্ন হচ্ছে হাশরের ময়দানে, যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোন কিছু বলা যাবে না। তাই তাঁদের এ উত্তর যথার্থ ও সঙ্গত যে, এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

**একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর-পয়গম্বরগণের চূড়ান্ত দয়ার্দ্রতা প্রকাশ ঃ** এখানে প্রশ্ন হয় যে, উম্মতের গ্রহণ করা ও গ্রহণ না করা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার যেসব ঘটনা তাঁদের সামনে সংঘটিত হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে প্রবল ধারণাপ্রসূত যে জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছিলেন, উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে অন্ততঃ তা বর্ণনা করা উচিত ছিল। এ জ্ঞানটি নিশ্চিত কি না, শুধু এ বিষয়টিই আল্লাহ্র জ্ঞানে সমর্পন করলে চলত। কিন্তু এখানে নবী-রসূলগণ নিজস্ব জ্ঞান ও সংঘটিত ঘটনাবলী একেবারেই উল্লেখ করেননি। সবকিছু আল্লাহ্র জ্ঞানের উপর সমর্পন করে তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন।

এর তাৎপর্য এই যে, নবী-রসূলগণ নিজ নিজ উম্মত ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। তাঁদের সম্পর্কে এমন কোন কথাই উচ্চারণ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক, যার ফলে তাঁরা বিপদের সম্মুখীন হয়। তবে নিরুপায় হলে অবশ্যই বলতে হত। এখানে অকাট্য জ্ঞান না থাকার অজুহাত ছিল। এ অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে মুখে উম্মতের বিরুদ্ধে কিছু বলা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন এবং সেমতে তাঁরা তাই করে আত্মরক্ষা করেছেন।

**হাশরে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন ঃ** সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের একটি ঝলক সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হিসাব-নিকাসের কাঠগড়ায় আল্লাহ্ তাআলার সর্বাধিক ঘনিষ্ট ও প্রিয় রসূলগণ কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন। সুতরাং অন্যদের যে কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই এখন থেকেই সে ভয়াবহ দিনের চিন্তা করা উচিত এবং জীবনকে এ হিসাব-নিকাস প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করা কর্তব্য।

তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন,

"হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তির পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নেয়া হয়। প্রথম এই যে, সে জীবনের সুদীর্ঘ ও প্রচুর সংখ্যক দিবারাত্রকে কি কাজে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় এই যে, বিশেষভাবে কর্মক্ষম যৌবনকালকে সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তৃতীয় এই যে, সে অর্থকড়ি কোন (হালাল কিংবা হারাম) পথে উপার্জন করেছে? চতুর্থ এই যে, অর্থকড়িতে সে কোন (জায়েয কিংবা নাজায়েয) কাজে ব্যয় করেছে? পঞ্চম এই যে, নিজ এল্‌ম্ অনুযায়ী সে কি আমল করেছে?

আল্লাহ্ তাআলা চূড়ান্ত অনুগ্রহ ও দয়া বশতঃ এ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাধ্যমে উম্মতের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এখন এসব প্রশ্নের সমাধান শিক্ষা করাই উম্মতের কাজ। পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র প্রকাশ করে দেয়ার পরও যদি কেউ ফেল করে, তবে এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

**হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে বিশেষ প্রশ্নোত্তর ঃ** প্রথম আয়াতে সমগ্র পয়গম্বরগণের অবস্থা ও তাঁদের সাথে প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এবং এর পরবর্তী নয় আয়াতে (সূরার শেষ পর্যন্ত) বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের শেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে আলোচনা ও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কিছু বিবরণ দেয়া হয়েছে। হাশরে তাঁকে একটি বিশেষ প্রশ্ন ও তার উত্তর পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

এ প্রশ্নোত্তরের সারমর্ম ও বনী-ইসরাঈল তথা সমগ্র মানব জাতির সামনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা। এ ময়দানে রূহুল্লাহ্ ও কলেমাতুল্লাহ্ অর্থাৎ, ঈসা (আঃ)-কেও প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার উম্মত তোমাকে আল্লাহ্র অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। হযরত ঈসা স্বীয় সম্মান, মাহাত্ম্য, নিষ্পাপতা ও নবুওয়ত সত্ত্বেও অস্থির হয়ে আল্লাহ্র দরবারে সাফাই পেশ করবেন। একবার নয়, বার বার বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করবেন যে, তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দেননি। প্রথমে বলবেন ঃ

سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْٓ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ

অর্থাৎ, আপনি পবিত্র, আমার কি সাধ্য ছিল যে, আমি এমন কথা বলব, যা বলার অধিকার আমার নেই?

স্বীয় সাফাইয়ের দ্বিতীয় ভঙ্গি এই যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাকে

সাক্ষী করে বলবেন ঃ যদি আমি এরূপ বলতাম, তবে অবশ্যই আপনার তা জানা থাকত। কেননা, আপনি তো আমার অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কেও অবগত। কথা ও কর্মেরই কেন, আপনি তো 'আল্লামুল-গুয়ুব', যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

এ দীর্ঘ ভূমিকার পর হযরত ঈসা (আঃ) প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

**হযরত ঈসার উত্তর ঃ** আমি তাদেরকে ঐ শিক্ষাই দিয়েছি, যার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র দাসত্ব অবলম্বন কর, যিনি আমার ও তোমাদের সকলের পালনকর্তা। এ শিক্ষার পর আমি যত দিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সাক্ষী ছিলাম, (তখন পর্যন্ত তাদের কেউ এরূপ কথা বলত না –) এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নেন, তখন তারা আপনার দেখাশোনার মধ্যেই ছিল। আপনিই তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

**হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহের বর্ণনা ঃ** আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে যে প্রশ্নোত্তরের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার পূর্বে ঐসব অনুগ্রহের বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে, যা বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-কে মো'জেযার আকারে দেয়া হয়। এতে একদিকে বিশেষ অনুগ্রহ ও অপরদিকে জবাবদিহির দৃশ্যের অবতারণা করে বনী-ইসরাঈলের ঐ জাতিদ্বয়কে হুশিয়ার করা হয়েছে, যাদের এক জাতি তাঁকে অপমানিত করে এবং নানা অপবাদ আরোপ করে কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি 'খোদা' কিংবা 'খোদার পুত্র' আখ্যা দেয়। অনুগ্রহ উল্লেখ করে প্রথম জাতিকে এবং প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করে শেষোক্ত জাতিকে হুশিয়ার করা হয়েছে। এখানে যেসব অনুগ্রহ কয়েকটি আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি বাক্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে ঃ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا অর্থাৎ, হযরত ঈসা (আঃ)-কে দেয়া একটি বিশেষ মো'জেযা এই যে,তিনি মানুষের সাথে শিশু অবস্থায়ও কথা বলেন এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন।

এখানে প্রথমোক্ত বিষয়টি যে, মো'জেযা ও বিশেষ অনুগ্রহ, তা বলাই বাহুল্য। জন্মগ্রহণের প্রথম দিকে শিশু কথা বলতে পারে না। কোন শিশু মায়ের কোলে কিংবা দোলনায় কথাবার্তা বললে, তা তার বিশেষ স্বাতন্ত্র্যরূপে গণ্য হবে। পরিণত বয়সে কথা বলা, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রত্যেক মানুষই এ বয়সে কথা বলে থাকে। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, এটিও একটি মো'জেযা। কেননা, পরিণত বয়সে পৌঁছার পূর্বেই ঈসা (আঃ)-কে ইহজগত থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। এখন এ জগতের মানুষের সাথে পরিণত বয়সে কথা বলা তখনই হতে পারে, যখন দ্বিতীয় বার তিনি এ জগতে পদার্পণ করবেন। মুসলমানদের সর্বসম্মত বিশ্বাস তাই এবং কোরআন ও সুন্নাহর বর্ণনা থেকেও একথাই প্রমাণিত। অতএব, বোঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর শিশু অবস্থায় কথা বলা যেমন মো'জেযা, তেমনি পরিণত বয়সে কথা বলাও একটি মো'জেযা। কারণ, তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে পদার্পন করবেন।

**মো'জেযা দাবী করা মুমিনের পক্ষে অনুচিত ঃ** قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ যখন হাওয়ারীরা ঈসা (আঃ)-এর কাছে আকাশ থেকে খাদ্যাধার অবতারণ দাবী করল, তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এতে বুঝা যায় যে, ঈমানদার বান্দার পক্ষে এ ধরনের ফরমায়েশ করে আল্লাহ্‌কে পরীক্ষা করা কিংবা তাঁর কাছে অলৌকিক বিষয় দাবী করা একান্ত অনুচিত। বরং ঈমানদার বান্দার পক্ষে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথে রুযী ইত্যাদি অন্বেষণ করাই কর্তব্য।

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ
تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ
خَيْرُ الرّٰزِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللّٰهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ
مِنْكُمْ فَإِنِّيٓ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِينَ ﴿١١٥﴾
وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي
وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أَقُولَ
مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۖ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي
وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ
إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِٓ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ
شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ
وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ
تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ
الصّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ
فِيهَآ أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾
لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

*(১১৪) ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন ঃ হে আল্লাহ্, আমাদের পালনকর্তা। আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। (১১৫) আল্লাহ্ বললেন ঃ নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না। (১১৬) যখন আল্লাহ্ বললেন ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম। তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহ্কে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। (১১৭) আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব অবলম্বন কর— যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। (১১৮) যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। (১১৯) আল্লাহ্ বললেন ঃ আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্যে উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিরকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা। (১২০) নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।*

## আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

**নেয়ামত অসাধারণ বড় হলে অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও বড় হয়ঃ** فَإِنِّيٓ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّآ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِينَ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, নেয়ামত অসাধারণ ও অনন্য হলে তার কৃতজ্ঞতার তাকিদও অসাধারণ হওয়া দরকার এবং অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও অসাধারণ হওয়াই স্বাভাবিক।

মায়েদা তথা খাদ্যাধার আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল কি না, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেন ঃ অবতীর্ণ হয়েছিল। তিরমিযীর হাদীসে আম্মার ইবনে ইয়াসির থেকে বর্ণিত আছে যে, খাদ্যাধার আকাশ থেকে নাযিল হয়েছিল এবং তাতে রুটি ও গোশ্ত ছিল। এ হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, তারা (অর্থাৎ, তাদের কিছু সংখ্যক) বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল এবং পরবর্তী দিনের জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। (نعوذ بالله من غضب الله)

এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, তারা তা ভক্ষণও করেছিল। আয়াতের نأكل শব্দে এ তথ্যও বিবৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ের জন্যে সঞ্চয় করে রাখা নিষিদ্ধ ছিল।— (বয়ানুল-কোরআন)

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى আল্লাহ্ তাআলা সবকিছু জানেন। সুতরাং অজানাকে জানার জন্যে ঈসা (আঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য খ্রীষ্টান জাতিকে তিরস্কার করা ও ধিক্কার দেয়া যে, যাকে তোমরা উপাস্য মনে করছ সে স্বয়ং তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীতে স্বীয় দাসত্ব স্বীকার করছে এবং তোমাদের অপবাদ থেকে সে মুক্ত।– (ইবনে-কাছীর)

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু অথবা আকাশে উত্থিত করা ইত্যাদি বিষয়ে সূরা-আলে-এমরানের إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي বাক্যটিকে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর দলীল ও আকাশে উত্থিত হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা ঠিক নয়। কেননা, এ কথোপকথন কিয়ামতের দিন হবে। তখন আকাশ থেকে অবতরণের পর তাঁর সত্যিকার মৃত্যু হবে অতীত বিষয়। ইবনে-কাসীর আবু-মূসা আশআরীর রেওয়ায়েত ক্রমে এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন নবী-রসূলগণকে ও তাঁদের উম্মতকে ডাকা হবে। অতঃপর ঈসা (আঃ)-কে ডাকা হবে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে স্বীয় নেয়ামতের কথা স্মরণ করাবেন এবং নিকটে এনে বলবেন ঃ হে মরিয়ম তনয় ঈসা, اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমি যে সমস্ত নেয়ামত দান করেছিলাম তা স্মরণ কর। অবশেষে বলবেন ঃ وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ হে ঈসা, তুমি কি লোকদেরকে এমন কথা বলেছ যে, আমাকে ও আমার মাতাকে আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্যরূপে গ্রহণ কর? ঈসা বলবেন ঃ পরওয়ারদেগার, আমি এরূপ বলিনি। এরপর খ্রীষ্টানদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তারা বলবে ঃ হাঁ, তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছিলেন। এরপর খ্রীষ্টানদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে দেয়া হবে।

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ অর্থাৎ, আপনি বান্দাদের প্রতি জুলুম ও

অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। তাই তাদেরকে শাস্তি দিলে তা ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞতা-ভিত্তিকই হবে। অগত্যা যদি ক্ষমা করে দেন, তবে এ ক্ষমাও অক্ষমতাপ্রসূত হবে না। কেননা, আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রবল। তাই কোন অপরাধী আপনার শক্তির নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। যেহেতু আপনি সুবিজ্ঞ, তাই এটাও সম্ভব নয় যে, অপরাধীকে বিনা বিচারেই ছেড়ে দেবেন। মোটকথা, অপরাধীদের ব্যাপারে আপনি যে রায়ই দেবেন, তাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞজনোচিত ও সক্ষমতাসুলভ হবে। হযরত ঈসা (আঃ) হাশরের ময়দানে এসব কথা বলবেন। সেখানে কাফেরদের পক্ষে কোনরূপ সুপারিশ, দয়া ভিক্ষা ইত্যাদি চলবে না। তাই তিনি عَزِيزٌ حَكِيمٌ এর পরিবর্তে غَفُورٌ رَحِيمٌ ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ অবলম্বন করেননি। এর বিপরীতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দুনিয়াতে পরওয়ারদেগারের দরবারে আরয করেছিলেন ঃ

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

হে পরওয়ারদেগার, এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের মধ্যে যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার লোক এবং যে আমার অবাধ্যতা করে, তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ, এখনও সময় আছে, তুমি স্বীয় রহমতে ভবিষ্যতে তাদেরকে তওবা ও সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনের শক্তি দান করে অতীত গোনাহ্ ক্ষমা করতে পার।— (ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

ইবনে-কাসীর হযরত আবু যরের (রাঃ) বাচনিক বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সাঃ) একবার সারা রাত্রি إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ আয়াতখানিই পাঠ করতে থাকেন। ভোর হলে আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনি এ আয়াতটিই পাঠ করতে করতে ভোর করেছেন। এ আয়াত দ্বারাই রুকূ করেছেন এবং এ আয়াত দ্বারাই সেজদা করেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি পরওয়ারদেগারের কাছে নিজের জন্যে শাফায়াতের আবেদন করেছি। আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। অতি সত্বরই আমি তা লাভ করব। আমি এমন ব্যক্তির জন্যে শাফায়াত করতে পারব, যে আল্লাহ্ তাআলার সাথে কোন অংশীদার করেনি।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মহানবী (সাঃ) উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে আকাশের দিকে হস্ত প্রসারিত করেন এবং বলেন ঃ اللهم امتى অর্থাৎ, হে পাক পরওয়ারদেগার, আমার উম্মতের প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও। অতঃপর তিনি কাঁদতে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলের মাধ্যমে এভাবে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জিবরাঈলকে উপরোক্ত উক্তি শুনিয়ে দেন। আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈলকে বললেন ঃ তা হলে যাও এবং (হযরত) মুহম্মদ (সাঃ)-কে বলে দাও যে, আমি অতিসত্বর আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব— অসন্তুষ্ট করব না।

قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ — সাধারণভাবে বাস্তবসম্মত উক্তিকে 'সিদক' তথা সত্য এবং বাস্তব বিরুদ্ধ উক্তিকে 'কিযব' তথা মিথ্যা মনে করা হয়। কিন্তু কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে জানা যায় যে, সত্য ও মিথ্যা শুধু উক্তিই নয়, কর্মও হতে পারে। নিম্নোক্ত হাদীসে বাস্তব বিরোধী কর্মকে মিথ্যা বলা হয়েছে ঃ

من تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوب زور — 'অর্থাৎ, কেউ যদি এমন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, যা তাকে দেয়া হয়নি, অর্থাৎ, এমন কোন গুণ বা কর্ম দাবী করে, যা তার মধ্যে নেই, তবে সে যেন মিথ্যার বস্ত্র পরিধান করে।'

অন্য এক হাদীসে প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তমরূপে নামায আদায়কারীকে সত্য বান্দা বলা হয়েছে ঃ

যে ব্যক্তি জনসমক্ষে উত্তমরূপে নামায পড়ে এবং নির্জনতায়ও এমনিভাবে নামায পড়ে, তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ সে আমার সত্যিকার বান্দা।- (মেশকাত)

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ অর্থাৎ, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি। এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ জান্নাত পাওয়ার পর আল্লাহ্ তাআলা বলবেন ঃ বড় নেয়ামত এই যে, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট; এখন থেকে কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।

ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ — অর্থাৎ, এটিই মহান সফলতা। স্রষ্টা ও পরম প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে গেলে এর চাইতে বৃহত্তর সফলতা আর কি হতে পারে?

*।। সূরা মায়েদাহ সমাপ্ত ।।*